ছুট
মনন দাস

মনন দাস

Chhoot

by Manan Das

প্রকাশক ঃ মহামায়া দাস
৬০/২, ব্যানার্জী বাগান লেন
সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১ ১০৬

ই-বুক প্রকাশ ঃ বড়দিন, ২০২৩

মূল্য ঃ বিনামূল্যে ই-বই

ছুট

সময়কাল
২০১০

(এই কাহিনীর সব চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক)

লেখকের অন্যান্য ই-বই ঃ

কবিতা সংগ্রহ
www.archive.org/details/KobitaSangraha

White Flowers
www.archive.org/details/WhiteFlowers

গল্প ঃ
অন্যস্বাদ
www.archive.org/details/AnyaSwad

গল্প পঞ্চক
www.archive.org/details/galpa-panchak

উপন্যাস ঃ
মনভূমি
www.archive.org/details/Manabhumi

ঝলমলি
www.archive.org/details/Jhalmali

গোবু গোবিন্দ
www.archive.org/details/gobu-gobinda

কিশোর উপন্যাস ঃ
রাজু নারানের কীর্তি
www.archive.org/details/RajuNaranerKirti

ছড়ায় লেখা মজার গল্প ঃ
আটটা ঠাট্টা
youtube search Manan Das / Four Fun
youtube search Manan Das / More Four Fun
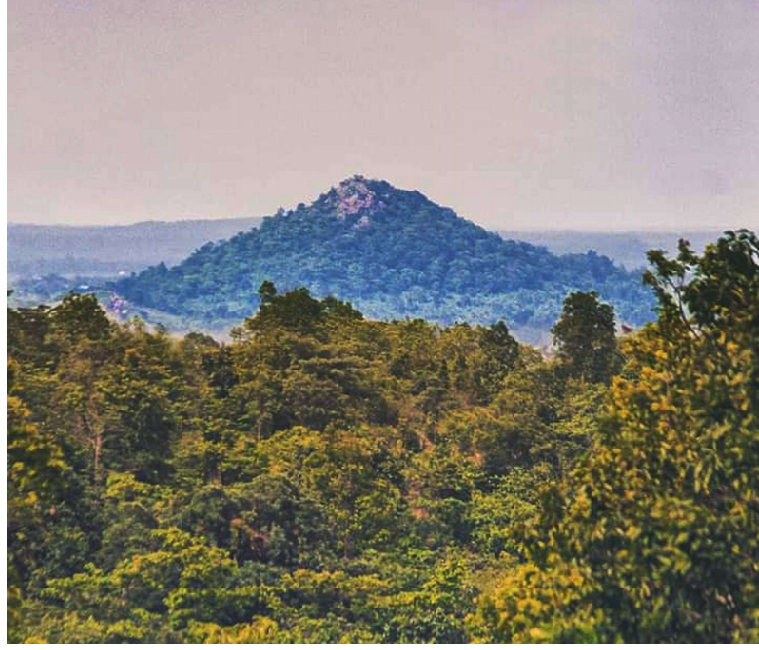
এক

আজ মঙ্গলবার। আজ রাতে বসন আসতে পারে। ঘুম ভেঙেই কথাটা মনে হল লক্ষীমতির। বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে গেল সে, জানালা খুলে দিল। একঝলক ঠান্ডা গড়িয়ে পড়ল ঘরে। এখনও রোদ ওঠেনি, মাঠ পেরিয়ে দূরের ওই গাছপালা—আরও দূরে পাহাড়ের গা হালকা কুয়াশায় ঢাকা। দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে লক্ষীমতির বুকটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল, কান্না উঠে আসতে চাইছে, কষ্টে দমন করে সে বিছানার দিকে ফিরল, ডাকল—ভরত— ও ভরত, ওঠরে, আজ মঙ্গলবার, বড়ো বেগুনটা গাছ থেকে তুলবি বলেছিলি যে—

গুটিশুটি শরীরটাকে কাঁথার ভেতর লম্বা করল ভরত। কাঁথাটা বেশ গরম। আসলে এই কাঁথাটার ভেতরে আছে একটা কম্বল। ছেঁড়া কম্বলটা সেলাই করে, তার ওপর কাপড় বসিয়ে কাঁথাটা তৈরি করেছে লক্ষীমতি। সারাদিন কাঁথাটা উঠোনের দড়িতে টাঙানো থাকে, সারাদিন রোদ পেয়ে গরম হয়ে থাকে। কাঁথাটা গায়ে জড়িয়েই বিছানা থেকে নামল ভরত, ছুটল পিছনের বাগানের দিকে।

সাতদিন ধরে রোজই ছেলেটা বলছে—মা, বেগুনটা আজ তুলব?

—না রে, ওটা আরও বড়ো হবে—বলেছে লক্ষী, অবশেষে আজ সকালে সম্মতি দিল, বলল তুলে আনতে।

বাগান বলতে বুনোগাছের ডালপালা দিয়ে ঘেরা এক টুকরো জমি, তাতে দু চারটে বেগুন টমেটো কাঁচালঙ্কা—এইসব গাছ লাগানো, একদিকে কিছুটা জায়গা ধনে গাছে নিবিড় হয়ে আছে। একটা গাছ থেকে বড়ো বেগুনটা তুলে নিল ভরত, কয়েকটা ধনে গাছ তুলল। আজ স্কুল যাওয়ার সময় বেগুনপোড়া আর ভাত, সঙ্গে একটু কাঁচা তেঁতুল ধনেপাতা আর কাঁচা লঙ্কা বাটা চাটনি। দারুণ লাগবে খেতে। কাল বিকালবেলা স্কুল থেকে ফেরার সময় অনেকগুলি কাঁচা তেঁতুল পেড়ে এনেছে সে।

বেগুন আর ধনেপাতা দুয়ারে রেখে গুটিশুটি বসল ভরত, রোদ উঠছে।

—ও কিরে? ঘুম থেকে উঠে এখন রোদ পোয়াতে বসলি? কদিন বাদে পরীক্ষা, যা, মুখ ধুয়ে পড়তে বোসগে— গা থেকে কাঁথাটা খুলে নিয়ে উঠোনের দড়িতে মেলে দিল লক্ষ্মী। ভরতের গায়ে এখন শুধুই একটা জামা। তাও আবার কাঁধের কাছটা ছেঁড়া। দুটো হাত বুকের কাছে জড়ো করে—উরে বাবারে, কি শীতরে—বলতে বলতে ছুটল।

উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে লক্ষী আপন মনে বক বক করে—চার কেলাস তো হয়েই গেল। আর কি, ইস্কুলের পাটও চুকে গেল! এরপর আর কী করবি, ছোটু নদীতে মাছ ধরবি গামছা ছেঁকে আর বনে বাদাড়ে ঘুরবি। সে কপাল কী আর করেছি! আমার বেটারা লেখাপড়া শিখে ইস্কুল মাস্টার হবে, নাকি ইষ্টিশান মাষ্টার হবে! বড়োটাকে কত কষ্ট করে দশ কেলাস টেনেও শেষটুকু আর হলনি!—বকতে বকতে গলার স্বর অশ্রুরুদ্ধ— ও বাবা বসন রে!—বলে ডুকরে কেঁদে উঠল। কিন্তু পরক্ষণে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কান্না আটকাল।

আজ মঙ্গলবার, আজ রাতে বসন আসবে বলে গেছে—মনে মনে হিসাব করল লক্ষী—বসন এসেছিল আরও দুটো মঙ্গলবার আগের মঙ্গলবারে, বলে গিয়েছিল তিন মঙ্গলবারের বার আসতে পারে। দুয়ারে দাঁড়িয়ে বনবিছুটির বেড়ার ওপর দিয়ে দূরে দৃষ্টি ভাসাল—ধান কেটে নেওয়া শূণ্য মাঠ পেরিয়ে ওই দূরে জঙ্গল—তার ওপরে মাথা তুলে হাতিঢাল পাহাড়— সেদিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখদুটি ঝাপসা হয়ে এল।

গ্রামের নাম কমলিয়া। চারপাশে ধানক্ষেত দিয়ে ঘেরা ছোটো গ্রাম। এখানে ধানক্ষেত দিগন্ত বিস্তৃত নয়, অল্পবিস্তর জমি, তার মধ্যে আছে একটা জলাশয়—পদ্মপাতায় ঢাকা—সাদা পদ্ম। শরতকালে যখন নীল আকাশে থমকে থাকে সাদা মেঘের পাহাড় তখন মাঠ ধানগাছের সবুজে সবুজ, আর তার মাঝে পদ্মপুকুরে সাদা পদ্মের মেলা! দূরে নীল আকাশের কোলে সবুজ পাহাড়ের ঢেউ, তার ওপারে ঝাপসা কালো—আরও দূরে প্রায় অদৃশ্য নীল পাহাড়ের থমকে থাকা ঢাল। পাহাড়ের মাথায় মাথায় সাদা মেঘের স্তূপ। গ্রামের পাশে ছোটো এক নদী ওই দূর পাহাড় থেকে নাচতে নাচতে এসে চলে গেছে দূরে সুবর্ণরেখার দিকে। নদীর বুকে বড়ো বড়ো লালচে আর কালো পাথর। এ পাথর ও পাথরের ফাঁক দিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে জলধারা বয়ে যায়। গ্রামের ছেলেরা

স্নান করতে গিয়ে ওই পাথরের আড়ালে আড়ালে লুকোচুরি খেলে, গামছায় ছেঁকে ছোটো ছোটো মাছ ধরে।

গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে মাত্র। চতুর্থ শ্রেণীতেই সবাই পড়াশোনায় ইতি করে গরু চরায়, ছাগল চরায়, বন বাদাড়ে ঘোরে, এমনি করেই বড়ো হয়ে যায়।

ভরতদের বাড়িতে ভরতের এক দাদা ছিল—বসন্ত, এক দিদি ছিল—ভানুমতি আর ছিল ঠাকুরমা। ঠাকুরমা বুড়ি থুড়থুড়ি, প্রায় সারাদিন রোদে বসে থাকত— ভরতের একটু একটু মনে পড়ে। মাঝে মাঝে কোলের কাছে বসতে বলত। ওই দূর পাহাড়ের রাক্ষসের গল্প বলত। বলত— ওই পাহাড়ের ওদিকে যেতে মানা—সেসব গল্প একটু একটু মনে পড়ে ভরতের। আর মনে পড়ে দাদার কথা। গত বছর তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময়ও দাদা তাকে রোজ পড়াত, অঙ্ক করাতো। দাদা পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। কোথায় যেন একটা বড়ো ইস্কুলে দাদা দশ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। সেই ইস্কুল অনেক দূরে, দাদাকে সেখানে থাকতে হতো। পড়াতে বসে সেই ইস্কুলের কত গল্প করত দাদা, ইস্কুল ছেড়ে আসার জন্য দাদার বড়ো কষ্ট। বনজঙ্গল আর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে বড়ো ভালোবাসত ও। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরত। দাদার জন্য বড্ড মন কেমন করে ভরতের।

দিদির জন্যও মন কেমন করে ভরতের। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। গত বছর এসেছিল একবার। বিয়ে হয়ে দিদি কেমন পর হয়ে গেছে। দুদিন থেকেই বলে যাই যাই। দিদি নেই, দাদাও কোথা চলে গেছে ওই পাহাড়ের ওপারে—সে কি রাক্ষসের দেশে?

বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গেছে। বাবাও বাড়িতে নেই। এখন চাষের কাজ নেই বলে বাবা গেছে পাথর খাদানে কাজ করতে। সে অনেক দূর, রেলগাড়ি চেপে যেতে হয়। সেখানে নাকি পাথর ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হয়। ভরত মনে মনে ভেবে রেখেছে সামনের বছর বাবাকে বলবে ওকে নিয়ে যেতে।

দোরে চাটাই পেতে পড়তে বসেছে ভরত। একা একা পড়তে মোটেই ভালো লাগে না তার। পড়তে বসলেই দাদার কথা মনে পড়ে। আজ আরও বেশি করে মনে পড়ছে। বেগুনপোড়া দিয়ে রুটি খেতে দাদা খুব ভালোবাসত। দোরে রাখা বেগুনটার দিকে তাকিয়ে ভরতের কান্না পেল।

—পড়া শুনতে পাই না কেনরে ভরত?—রান্নাঘর থেকে বলল লক্ষী।

—এইত, অঙ্ক করছি যে—তাড়াতাড়ি অঙ্কর খাতা খোলে ভরত।

—বলছি কি, বেগুনটা ওবেলা পোড়ালে হয় না? বেশ রুটি দিয়ে খাওয়া যেত?— জিজ্ঞাসা করল লক্ষী।

—কেন, এবেলাই তো ভালো। ভাত দিয়ে খাব!

—তোর দাদা রুটি দিয়ে খেতে ভালোবা—বলতে বলতে হঠাৎ কথাটা বন্ধ করে উঠে এলো, দোরে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে ইতিউতি তাকাল, কেউ কোথাও নেই—

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, আঁচলে মুখ মুছে ফিরে তাকাল। ভরত অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে—তার দিকে চোখ পড়তে কেমন যেন হয়ে যায় লক্ষী।

—দাদা খাবে? রুটি দিয়ে? দাদা আসবে নাকি?—খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভরতের মুখ।

—না না, শঙ্কিতভাবে বলল লক্ষী, ভরতের কাছে এগিয়ে এল—অমন কথা বলিস না আর।

—তবে তুমি যে বললে?

—চুপ, চুপ।

চুপ—শুনে ভরতও কেমন হয়ে যায়,—মা এমন করছে কেন? তাহলে কি দাদা চুপিচুপি আসে লুকিয়ে? কেন?

—দাদা তাহলে রাতে চুপি চুপি আসে, তুমি আমাকে ডাকো না—অভিমানে ভারি গলা ভরতের।

—আঃ, কাউকে এসব কথা বলিস না।

—কেন?

—সেসব অনেক ব্যাপার, তুই বুঝবি না, জানলে দাদাকে ধরে নিয়ে যাবে, মারবে।

—কে?

—পুলিশ।

—কেন?

—আবার কেন? বলছি তুই সব বুঝবি না—কাঁদো কাঁদো গলায় বলল লক্ষীমতি।

—ঠিক আছে, কাউকে বলব না, কিন্তু দাদা এলে তুমি আমায় ডাকবে বলো?

—তুই আমার গা ছুঁয়ে বল কাউকে কিছু বলবি না?

—এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি কাউকে কিছু বলব না।

—বললে আমি কিন্তু মরে যাব।

ভরত মায়ের হাতটা চেপে ধরল—খবরদার ওই কথা বলবে না বলছি।

রাত্রি নিঝুম। গভীর অন্ধকারে ডুবে নিদ্রামগ্ন গ্রাম। হিম পড়ছে। কী শীত! ঝিঁ ঝিঁ পোকারাও বুঝি শীতে জমে গিয়েছে। নিস্তব্ধ চরাচর। শুধু দুটি মানুষের চোখে ঘুম নেই। ভরত ভেবেছিল ঘুমিয়ে পড়বে, দাদা এলে মা তাকে ডাকবে, কিন্তু সারাদিন ধরে কী এক উত্তেজনা পেটের মধ্যে গুরগুর করছে, সন্ধ্যে থেকে আরও বেশি। খেতে বসে ভালো করে খেতে পারেনি ভরত। আর এখন সে যদিও আগাগোড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে কিন্তু ঘুম নেই।

সহসা দরজা খোলার ক্যাঁচোর শব্দ—মুখ থেকে ঢাকা সরাল ভরত, দেখল দাদার ছায়ামূর্ত্তি ঘরে, তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে সে দাদার কাছে এগিয়ে গেল, দুহাতে দাদার বাহু জড়িয়ে মুখ ঘসে ঘসে কাঁদতে লাগল নিঃশব্দে। দাদা মেঝেতে বসল, ভরতকে জড়িয়ে নিল।

সরু একটা মোমবাতি জ্বালল লক্ষীমতি, নিঃশব্দে ছেলের মাথায় বুকে হাত বোলাল। সে আদরের হাতে কী আকুলতা।

রুটি আর বেগুনপোড়া, আর একটু চুনো মাছের ঝাল—থালায় বেড়ে ছেলেকে খেতে দিল লক্ষী, মাছটুকু নদীর ধার থেকে জোগাড় করেছে সে। সামনে খাবার ও জলের গেলাস ধরে দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল সে, দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

পা টিপে টিপে বাড়ির পিছন দিয়ে ঘুরে পূব দিকে এসে আমগাছটার আড়ালে দাঁড়াল লক্ষী, এখান থেকে বাড়ির পিছন ও সামনের প্রায় সবটুকুই দেখা যায়।

ঘরের মধ্যে তখন ভারী তৃপ্তি করে খাচ্ছে বসন্ত, কিন্তু তাড়াতাড়ি। একটু বেগুনপোড়া রেখে মাছের ঝাল দিয়ে খেতে লাগল। ভরত বুঝল দাদা ওই বেগুনপোড়াটুকু খাওয়ার শেষে খাবে।

—তুই আর যাস্‌না দাদা—চুপি চুপি বলল ভরত।

—না গেলে ওরা এসে আমায় টেনে নিয়ে যাবে।

—কারা?

—ওই দূর পাহাড়ের ওধারে—যাদের সঙ্গে আমি থাকি।

—আসুকগে, তুই যাবি না।

—না গেলে মেরে ফেলে রেখে যাবে। আর ওরা না এলেও পুলিশ আসবে রে, ধরে নিয়ে গিয়ে খুব মারবে।

খাওয়া প্রায় শেষ—সহসা রুটি চিবোতে চিবোতে থেমে গেল বসন্ত, কান পেতে কিছু শুনতে চাইল—সামান্য কিছু শব্দ যেন—মোমবাতি নিভিয়ে দিল বসন্ত।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভরত দেখল দরজাটা সামান্য ফাঁক হলো, আরও একটু পরে আরও ফাঁকা, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে দাদাকে বেরিয়ে যেতে দেখল।

হামাগুড়ি দিয়ে দোরে বেরিয়ে বসন্ত খুব সন্তর্পণে ওভাবেই এগিয়ে চলল রান্নাঘরের দিকে। দোরে দাঁড়ালে বনবিছুটির বেড়ার ওপারে রাস্তা থেকে দেখা যাবে, কিন্তু এভাবে একটা অন্ধকারের পুঁটুলি এগোলে দেখা যাবে না।

রান্নাঘর বলতে চালাঘর, ওটার পিছন দিকটা ফাঁকা। জ্বালানির জন্য শুকনো ডালপালা জড়ো করে রাখা আছে তাই আড়াল। তারই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জায়গা করে রেখেছে মা। ওখান দিয়ে সাবধানে বাইরে উঁকি দিল বসন্ত।

অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল বসন্ত, মাঠে পড়ল, খানিকটা এগিয়ে চারিদিক ভালো করে দেখে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর ছুটতে শুরু করল। দূরে পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বলছে—ওদিকে লক্ষ্য করে ছুটল সে, ওখানে আগুন পোহাচ্ছে সঙ্গী দুই পাহারাদার।

বাড়ির সামনে বনবিছুটির বেড়ার বাইরে দুজনের ছায়ামূর্ত্তি।

—ভরত ঘুমোচ্ছিস নাকিরে?—বলল একজন।

লক্ষীমতি এগিয়ে এসে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়াল, বলল—কে?

—আমি, মোহনকাকা।

—আর কে?

—গোবিন্দ।

—কি দরকার?

—কিছু না, ওই পাশের গাঁয়ে গিয়েছিলুম নেমন্তন্ন, ফিরছি, ভাবলুম একবার হাঁক দিয়ে যাই, একা ছেলেটাকে নিয়ে থাকিস! তা এত রাতে বাইরে কেন?

—বাইরে গেছিলুম।—বলে ডান হাতটা জোরে জোরে দুবার দোলাল লক্ষী।

—তোর হাতে ওটা কি?—চমকে জিজ্ঞাসা করল মোহনকাকা।

—কাস্তে। রাতভিতে এটা নিয়ে শুই, এটা নিয়ে বাইরে যাই—আবার হাত দোলাল লক্ষী—আমার কোনো ভয় নাই।

—ভালো ভালো, সাবধানের মার নাই। তা ইয়ে—বসন্ত আসে নাকি?

—কই না ত!

—অ!—

দুজন চলে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরে যায় লক্ষীমতি।

ঘরে এসে আবার মোমবাতিটা জ্বালে। থালায় একটুখানি বেগুনপোড়া পড়ে আছে, খাওয়ার শেষে ওটুকু তারিয়ে তারিয়ে খাবে বলে রেখেছিল বসন্ত, খাওয়া হয়নি। দেখতে দেখতে চোখ ভিজে গেল লক্ষীমতির। থালাটা একদিকে সরিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল।

—দাদা কত রোগা হয়ে গেছে, না মা?—ফিস ফিস করে বলল ভরত।

মা বলল—চুপ।

দুই

আজ শনিবার। আজ হাফ ছুটি। স্কুলের ছুটির পর হৈ হৈ করে সবার সঙ্গে ভরত চলেছে বাড়ির দিকে। শনিবার ভাত খেয়ে স্কুলে আসে না সে, স্কুল থেকে ফিরে মায়ের সঙ্গে খায়।

পিছন থেকে কে যেন ডাকল—ভরত-ভরত— সে দাঁড়িয়ে পড়ল, পিছনে তাকাল। প্যান্ট শার্ট পরা বাবু মতো একজন লোক এগিয়ে এল তার দিকে।

কানু, ভোলা আর বাদল—ভরতের বন্ধুরা—তারাও কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—ভরত থাকুক, আর সবাই চলে যাও,—বলল লোকটি, সকলে অনিচ্ছুক ভাবে একটু সরে গেল কিন্তু চলে গেল না। এখন ভরত আলাদা।

—যাও না তোমরা—লোকটি আবার বলল। ওরা আরেকটু সরে গেল। বিরক্ত মুখে লোকটি চোখ পাকিয়ে ওদের দিকে তাকাল।

লোকটির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল ভরত, ওর কেমন ভয় ভয় লাগছিল। লোকটি হঠাৎ তার মুখভঙ্গি পাল্টে ফেলল, হাসি হাসি মুখ করে ভরতের কাঁধে হাত দিয়ে রাস্তার পাশে একটু সরে দাঁড়াতে চাইল, চুপি চুপি বলল—আমি তোমার দাদার বন্ধু।

কাঁধ বাঁকিয়ে হাতটা সরিয়ে দিতে চাইল ভরত, সরে গেল একটু।

—তোমার দাদা তোমাকে একটা জিনিস পাঠিয়েছে—হাসি হাসি মুখ করে বলল লোকটি, সেদিন রাত্তিরবেলা পকেটে করে এনেছিল কিন্তু দিতে পারেনি, এই নাও—বলতে বলতে পকেট থেকে রাংতা মোড়া একটা জিনিস বার করল লোকটি— এটা হলো চকোলেট, দারুণ খেতে।

ভরতের মন বলছিল লোকটা ভালো নয়। অথচ লোকটা দেখতে ভালো মানুষের মতোই। দেখে ভয় পাওয়ার মতো মোটেই নয়। ওর জামাকাপড়ও ভালো। কথাও ভালো—কিন্তু তবু ভরতের মন বলছিল লোকটা ভালো নয়। আর মনে পড়ছিল মায়ের কথা—কাউকে কিচ্ছুটি বলবি না—

অত বড়ো চকোলেট ভরত কখনও দেখেনি। একবার তার ইচ্ছাও হচ্ছিল ওটা নেয়। কিন্তু ওটার নিশ্চয় অনেক দাম! দাদা চকোলেট কিনবার পয়সা পাবে কোথায় অত? সেই একবার ওরা মেলা দেখতে গিয়েছিল—এক টাকার বাদামভাজা কিনতে পারেনি বলে দাদার কত দুঃখ!

সহসা ভরত ছুটতে শুরু করল।

—এ্যাই, এ্যাই ছেলেটা—বলতে বলতে লোকটাও তার পিছনে পিছনে।

ভরতের খুব ভয় লাগছিল—ছেলে ধরা নয়ত? সে শুনেছে ছেলেধরারা বাচ্ছা ছেলেদের কিছু খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে বস্তায় ভরে নিয়ে চলে যায়, তারপর তাদের বোবা করে দিয়ে ভিক্ষে করায়। আরও জোরে ছুটতে ছুটতে ভরত একেবারে বাড়ির সামনে—কিন্তু ওকি? উঠোনে ওরা কারা? ওরাই কি পুলিশ? বনবিছুটির বেড়ার বাইরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, শুনতে পেল মা চিৎকার করে বলছে—বলছি তো সে আসে না, আর কতবার বলব?

—কতদিন আগে এসেছিল?—একজন মেয়ের গলা শুনল ভরত।

—আসেনি, সেই যে বাড়ি থেকে চলে গেছে আর একদিনও আসেনি।

মায়ের কথা শুনতে শুনতে ভীষণ ভয় পেল ভরত— এরা তাকেও নিশ্চয় জিজ্ঞাসা

করবে। হয়ত মারবে—বেড়ার পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে পিছু হাঁটতে হাঁটতে সে সরে যেতে লাগল।

—তোমাকে একবার থানায় যেতে হবে, বড়বাবু ডেকেছে—পুলিশের গলা।

—আমার এখনও খাওয়া হয় নাই, ছেলেটা স্কুলে গেছে, তারও এখনও খাওয়া হয় নাই।

—ঠিক আছে, বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করেই এক্ষুনি চলে আসবে, গাড়িতে যাব গাড়িতে আসব—একটুখানি সময়, চল চল।

সহসা ভরত দেখল সেই লোকটা রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে, ও তাহলে পুলিশের লোক! এরা তাহলে তাকেও ধরে নিয়ে যাবে—প্রাণপণে ছুটল ভরত। ছুটতে ছুটতে একেবারে ছোটু নদীর ধারে, পিছন ফিরে দেখল—না, কেউ আসছে না—নদীগর্ভে নেমে গেল সে। বালির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একটা বড়ো পাথরের আড়লে লুকিয়ে পড়ল।

ক্ষুধায় ক্লান্তিতে ভয়ে ভরতের শরীর মন বিধ্বস্ত, পাথরের আড়ালে বালির ওপর শুয়ে পড়ল সে। ক্লান্তিতে তার চোখ বুজে এল, একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

জীবনে কখনও পুলিশ দেখেনি লক্ষীমতি, এই প্রথম দেখল, তাও আবার নিজের বাড়ির উঠোনে। শুধু পুলিশ নয় সঙ্গে মেয়ে পুলিশ! জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে প্রথম প্রথম মনের জোর রেখে যদিও কাটা কাটা উত্তর দিচ্ছিল কিন্তু ভেতরে ভেতরে ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছিল।

জিপ গাড়িতে উঠে তার দুপাশে দুজন মেয়ে পুলিশ বসল আর সামনে দুজন জোয়ান। সামনে যে বসল সে-ই মাতব্বর পুলিশ মনে হলো লক্ষীমতির, সে-ই সকলকে হুকুম করছিল, ওকেই বলে বোধহয় দারোগা!

গাড়ি ছুটল হু হু করে আর লক্ষীমতির মাথাও ঘুরতে শুরু করল। কোথায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে এরা? কি করবে? কে বড়বাবু? সে কী আরও বড়ো দারোগা? খুব মারবে নাকি?

—ও বসনের বাবা, তুমি কোথায় গো! ও বাবা বসন তুই কোথায় গেলি বাপ আমার—এসব বলে কাঁদতে লাগল সে। বুকের মধ্যে হু হু করছে তার। কোথায় কোন দূর জগতে তাকে নিয়ে যাচ্ছে এরা? সেখান থেকে আর ফিরতে পারবে না সে।

এভাবে একসময় তারা একটা বড়ো লাল রঙের বাড়ির কাছে পৌঁছাল। সবাই নেমে লক্ষীকে নামতে বলল। লক্ষী দাঁড়াতে পারছিল না, তার পা কাঁপছিল। মেয়ে পুলিশ দুজন তাকে দুপাশ থেকে ধরে ফেলল, কোনোরকমে চেয়ারে বসিয়ে দিল।

সামনে বিরাট টেবিল। একদিকে বড়ো বড়ো মোটা মোটা লোহার রডের গারদ—দেখতে দেখতে মাথা ঘুরতে লাগল লক্ষীমতির—ওই গারদে তাকে বন্ধ করে রাখবে নাকি?

গটগট করে ঢুকলেন লম্বা চওড়া চেহারার বড়বাবু। দেখে লক্ষীর বুক ধড়ফড়!

—ওকে নিয়ে এলাম স্যার, কিছুই বলতে চাইছে না—বললেন ছোটদারোগা।

—এটা কি করলে সমীরণ?—বললেন বড়বাবু—ধরে আনলে কেন?

—এখানে এনে আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করলে হয়ত কিছু জানা যেতে পারে। দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করে আবার দিয়ে আসব বলেছি।

—দেখছ চারিদিকে কী অবস্থা! একজন মহিলাকে বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করা পর্যন্ত ঠিক আছে। একেবারে তুলে আনা—একটা বড়ো হামলা হয়ে গেলে তখন কে সামলাবে?

এইসব তর্কাতর্কি শুনতে শুনতে লক্ষীমতির কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ। প্রচণ্ড খিদেয় পেট জ্বালা করছে। চারিদিক ঘুরতে শুরু করল, চোখে অন্ধকার নেমে এলো, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল সে। টেবিলের কোনাটা মাথায় লেগে রক্ত বেরোচ্ছে, হৈ হৈ ব্যাপার। ধর ধর তোল তোল।

—এ হে হে, কেলেঙ্কারীর একশেষ, মহিলাকে মারধোরের বদনাম লেগে যাবে এবার। শিগগিরি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কর,—বড়বাবু হুকুম দিলেন।

প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘুম ভাঙল ভরতের। দিনের আলো আর নেই বললেই হয় বইখাতাগুলি তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে। এতক্ষণে পুলিশ নিশ্চয় চলে গেছে—ভাবল ভরত।

বাড়ির কাছাকাছি এসে আবার ভয়—এখনও পুলিশ তাকে ধরার জন্য বসে নেই তো? কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাড়ি অন্ধকার। সন্তর্পণে কাছে এগোল সে—না, কেউ কোথাও নেই, কোনো সাড়াশব্দও নেই। উঠোনে ঢুকে সে ডাকল—মা!—কেউ সাড়া দিল না। দোরে উঠে আবার ডাকল—মা!—না, কেউ নেই। কান্না পেল ভরতের—তাহলে ওরা মাকে ধরে নিয়ে গেছে। ঘরে ঢুকে হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই বার করল সে।

সরু মোমবাতিটা কোথায়—হাতড়াতে লাগল, পেল না, কিন্তু তাদের তো লম্ফ জ্বলে। মোমবাতিটা বোধহয় মা দাদা এলে জ্বালার জন্য রেখেছে—অল্প আলো, বাইরে থেকে বোঝা যাবে না।

দুটো কাঠি নষ্ট করে লম্ফটা পেয়ে গেল ভরত, জ্বালল। ক্ষুধা তার দৃষ্টি টেনে নিল সেদিকে যেখানে ভাতের হাঁড়ি থাকে। এগিয়ে গিয়ে বসল, ঢাকা খুলে দেখল ভাত। হাঁড়ির পাশে তরকারিও চাপা দেওয়া। থালা নিয়ে খানিকটা ভাত তুলে নিল, তরকারিও নিল, গোগ্রাসে খেয়ে ফেলল। বাকি ভাত তরকারি চাপা দিয়ে বাইরে গেল, হাত ধুয়ে জল খেল। কী তৃপ্তি!

কী ভীষণ ঠান্ডা হাওয়া আসছে—দরজাটা বন্ধ করে দিল। বাইরে কে যেন ছুটে যাওয়ার শব্দ—তাড়াতাড়ি লম্ফটা নিভিয়ে বিছানায় উঠে পড়ল, কাঁথায় মুখ ঢাকল। খুব ভয় করছিল তার, তবু ভয় পেতে পেতে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল পাখির ডাকে। আধো অন্ধকার ঘরে বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে রোদ্দুরের

কয়েকটি রেখা। রোজ সকালে মা জানলা খুলে দেয়, আজ—মনে পড়তেই ধড়ফড় করে উঠে বাইরে এল সে—কেউ কোথাও নেই। কী ফাঁকা বাড়িটা! বুকের মধ্যে এমন হু হু করে উঠল! কেঁদে ফেলল ভরত। কাঁদতে কাঁদতে দোরে বসল পা ঝুলিয়ে। এক করুণ আওয়াজ—মাঝে মাঝে মা শব্দটা শুধু বোঝা যাচ্ছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল ভরত।

তাদের বাড়িটা গ্রামের শেষে। তারপর উত্তর আর পূর্বদিকে শুরু ধানক্ষেত। সামনে রাস্তা, রাস্তার ওপারে কানাইদের বাড়ি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো কানাইয়ের বুড়িমা, লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে এগিয়ে এসে উঠোনে দাঁড়াল। তাকে দেখে কান্না আরও বেড়ে গেল ভরতের—ও সোনাদিদা আমার মা কোথায় গেল-অ-অ—

—তোর মা আসেনি?

—না-আ!

—অ মা! কী হবেগো! একা এইটুকু ছেলেটা। পুলিশের কী আক্কেল বাবা! যাকে ধরতে এয়েছিস ধর না, তাকে পেলুম না ত মাকে ধরে নিয়ে যাবি? বা রে বিচার! আর গাঁয়ের লোকেরও বলিহারি, কেউ এসে একটু দাঁড়াল না গো!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কানাই, এদিক ওদিক দেখে তবে উঠোনে ঢুকল, চেঁচাচ্ছ কেন মা? পুলিশের সামনে এসে কে দাঁড়াবে? সকলেরই তো ভয় আছে। বললেই হলো তুমিও আছ দলে! আমাদের হয়েছে জ্বালা, এদিকে পুলিশ ওদিকে ওরা—এগোলেও নিব্বংশ পেছোলেও নিব্বংশ!

—তাইলে এই বাচ্ছা ছেলেটা একা কী করবে? হ্যাঁ ভরত, বাসি ভাতটাত কিছু আছে ঘরে?

—হেঁ—ঘাড় নাড়ল ভরত।

—খেয়ে নে, মা এসে যাবে, আজ নিশ্চয় ছেড়ে দেবে। দরকার পড়লে আমাকে ডাকিস।

দুজনেই বেরিয়ে গেল।

সারাদিন কেটে গিয়ে রাত এলো, কিন্তু মা এলো না। উদভ্রান্ত ভরত সারাদিন কাটাল দোরে বসে পথের দিকে তাকিয়ে। চোখ দুটি টনটন করছে, বুজে আসছে, মনে হচ্ছে খুব জ্বর, গায়ে কাঁপ দিচ্ছে, ঘরে ঢুকে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

ভীষণ গোলমালের শব্দে ঘুম ভাঙল ভরতের। রাস্তা দিয়ে কারা যেন ধুপধাপ শব্দে ছুটে যাচ্ছে। কারা যেন চিৎকার করে কাঁদছে। এরপর শুরু হলো দুমদুম আওয়াজ—চিৎকার আর কান্না আরও বেড়ে গেল। ভয়ে সিটিয়ে গেল ভরত—ওই কি তাহলে বন্দুকের আওয়াজ? গুলি ছুঁড়ছে?

এমন সময় চাপা গলায় কে যেন ডাকল—ভরত-ভরত—

দরজাটা খুলে গেল, আবার ডাক—ভরত—

এতো দাদার গলা! ভরত লাফিয়ে বিছানা থেকে নামল। অন্ধকারে দাদা তার হাত ধরল, বলল—পালিয়ে আয়।

ঘর থেকে দোরে, দোর থেকে উঠোনে, উঠোন থেকে একছুটে মাঠে—প্রাণপণে দৌড়চ্ছিল দুজন। পায়ের নীচে এবড়ো খেবড়ো শুকনো মাটি, ধান কেটে নেওয়া গোড়াগুলি তীক্ষ্ণ শরের মতো ফুটছিল ভরতের পায়ে, তবু ছুটছিল, ছুটছিল, ছুটছিল।

সহসা ভরতের মনে হলো দাদা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ওই পাহাড়ের ওপারে? যারা দাদাকে আসতে দেয় না তাদের কাছে? থমকে দাঁড়াতে চাইল ভরত, হাতটানাটানি করতে লাগল।

—না দাদা আমি যাব না, পাহাড়ের ওপারে আমি যাব না, ওরা তাহলে আমাকেও আসতে দেবে না মায়ের কাছে—

—আমরা ওখানে যাচ্ছি না—দাদা বলল—বলতে বলতে কেঁপে উঠল, বলল—উঃ, কি রক্ত কি রক্ত! কিভাবে গুলি করে মারল। আমাদের দিলীপ স্যারকে! না না, আমি আর ওখানে যাবো না, আমরা পালাব ভরত—যেখানে হোক—অনেক অনেক দূরে—যেখানে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না। দাঁড়াস না, ছুটতে থাক—

ছুটতে ছুটতে ছুটতে মাঠ ছাড়িয়ে পথ, পথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে একসময় আর ছুটতে পারছিল না, মনে হচ্ছিল দুজনেই পড়ে যাবে। অবশেষে—আহ্! আলো! বিদ্যুতের আলো দূরে, বুকে বল এলো। ভরত অবাক হয়ে দেখছিল, আরেকটু ছোট, ওখানে পৌঁছতে হবে—ওই আলোর কাছে—বলল বসন্ত।

—ওটা কি দাদা?

—ওটা রেল স্টেশন, ওইদিকে রেললাইন, রেলগাড়ি যায় ওখান দিয়ে।

—আমরা রেলগাড়ি চাপব? উত্তেজনায় শরীরে নবীন বল—পৌঁছে গেল দুজন।

—আয় এখানে বসি একটু।—ভাইয়ের হাত ধরে বসন্ত ওয়েটিং রুমে ঢুকল। ওয়েটিং রুম বলতে তিনদিক খোলা ঘর, একদিকে টিকিট ঘর। কয়েকটা সিমেন্ট বাঁধানো বেঞ্চ। কেউ কোথাও নেই, শুধু একটা কুকুর গুটিশুটি হয়ে এক কোণে শুয়ে।

এতক্ষণ ছোটার জন্য শরীর উত্তপ্ত হয়েছিল, এখন সিমেন্টের ঠান্ডা বেঞ্চে বসে কনকনে হাওয়ায় কেঁপে উঠল দুজন। বসন্ত আসার সময় বিছানা থেকে ভরতের কাঁথাটা টেনে নিয়েছিল দুজনে সেটা গায়ে জড়িয়ে বসল।

—এটা তুই নিয়ে এসেছিস!—হাসল ভরত।

—আমি জানতুম এটা লাগবে—বলল বসন্ত।

কতক্ষণ আধো ঘুমে কাটল কে জানে, হঠাৎ ঢং ঢং ঘন্টার শব্দ জোরে জোরে—ঝিমুনি ছুটে গেল তাদের।

—গাড়ি আসছে—বসন্ত চুপি চুপি বলল—ওটায় উঠতে হবে।

বেরিয়ে এসে প্লাটফরমের আধো অন্ধকারে দাঁড়াল দুজনে।

তরপর রেলগাড়ি—মুক্তি-মুক্তি-মুক্তি! রাতের অন্ধকারে ছুটছে গাড়ি, ছুটতে ছুটতে মাঝে মাঝে থামা, দু একজন লোকের ওঠানামা—এভাবে কতক্ষণ চলতে চলতে সকালের রোদ্দুর, একটা স্টেশনে কালো কোট পরা একজন লোক উঠল, বলল—টিকিট?

—টিকিট নেই—ঢোক গিলে বলল বসন্ত।

ময়লা কাঁথা গায়ে রুক্ষ এলোমেলো চুল বিধ্বস্ত চেহারার ছেলে দুটিকে দেখে টিকিট পরীক্ষকের মনে হলো ভবঘুরে ভিখারি, কড়া গলায় ধমক দিল—নেমে যাও।

একটা ছোটো স্টেশনে থেমেছে গাড়ি, ওরা নেমে পড়ল। প্লাটফরমের একটা বেঞ্চে রোদ্দুরে বসল দুজনে। বসন্তর গায়ে একটা সোয়েটার আছে। কিন্তু ভরতের শুধুই জামা। রোদ্দুরে বসে বড়ো আরাম পেল ভরত। বেঞ্চে পিঠ এলিয়ে দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে বসেছে বসন্ত, চোখ বুজে কি যেন ভাবছে।

সহসা—উঃ—বলে চেঁচিয়ে উঠল বসন্ত।

—কি হলো দাদা? ভরত জিজ্ঞাসা করল।

—কিছুতে ভুলতে পারছি না—দুহাতে মুখ ঢাকল বসন্ত—রক্ত, রক্ত, উঃ! কিভাবে মারল, কত কান্নাকাটি করছিল স্যার, আঃ, আমাকে বলল—বসন্ত তুমি! আমি তোমার জন্য কত করেছি—

আমি বলতে চাইলাম—আমি নয় স্যার—কিন্তু—উঃ, আরও কাকে কাকে মারল জানি না, ঘর থেকে ডেকে ডেকে বার করে—আমাদেরই গ্রামের লোক, সেই ছোটোবেলা থেকে দেখছি, তাদের ওরকমভাবে মেরে ফেলল? ওরাও তো গরীব।

—কেন মারল? ভরত ভয়ে ভয়ে বলল।

—সব খবর চলে যায়, কারা আমাদের বিরুদ্ধে, কারা আমাদের ওপর নজর রাখছে, কারা পুলিশকে খবর দেয়। আমরা কাল দল বেঁধে এসেছিলুম, বন্দুক নিয়ে। আমাকে বন্দুক দেয়নি, আমি এখনও বন্দুক চালাতে পারি না, হাত কাঁপে।

—তুই ওদের দলে গিয়েছিলি কেন দাদা?

—স্কুল ছেড়ে চলে এলাম, কিছু করার নেই, ঘুরে বেড়াই, সময় কাটে না, মনের মধ্যে আস্তে আস্তে কেমন রাগ জমছিল। ... দিলীপ স্যার রবিবার রবিবার কোথা থেকে যেন খবরের কাগজ আনতেন—সেটা পরদিন চেয়ে এনে পড়তাম—দেশের খবর পড়তে পড়তে মাথা আরও গরম হয়ে যেত ... কোথায় কোন শহরে গাড়িতে দু ঘন্টার রাস্তা আধ ঘন্টায় যাবার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে—অথচ আমাদের এখানে সামান্য একটু বাঁধানো রাস্তা নেই! অসুখ করলে পাঁচ-ছ কিলোমিটার হেঁটে স্বাস্থ্যকেন্দ্র—তাও সেখানে ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই! অথচ কত কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে কত বড়ো বড়ো হাসপাতাল বড়ো বড়ো শহরে ... কত সব বড়ো বড়ো স্কুল কলেজের খবর পাতা জুড়ে এমনকি বিদেশের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়—সেখানে পড়ার খরচ লক্ষ লক্ষ টাকা—অথচ আমাদের এখানে একটা সামান্য হাইস্কুল নেই—নেই সামান্য পড়াশোনা করার মতো টাকা!... নেই, নেই, নেই— জল নেই, বিদ্যুৎ নেই,

শিক্ষা নেই, চিকিৎসা নেই—তার মধ্যেও আবার চুরি! যতটুকু টাকা দেয় সরকার—সামান্য কিছু সাহায্য, সামান্য কিছু উন্নয়নের জন্য—তাও কিছু লোক ভাগাভাগি করে নেয়—সারা দেশটা কিছু বড়ো বড়ো মাথাওয়ালাদের লুটের জায়গা ... দুর্নীতি আর লুঠ ... লুঠ... লুঠ...'

এতসব কথা ভরত ঠিক বুঝছিল না,—বলল গল্পটা বল না, কোথায় গেলি, কি করে গেলি—

বসন্ত এতক্ষণ যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছিল, ভায়ের কথায় ম্লান হাসল, বলল—একদিন ছোটু নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম পাহাড়ে, যেখান থেকে বেরিয়েছে ওই নদী। সেখানে শুধুই নুড়ি, বড়ো বড়ো ছোটো ছোটো—জায়গাটা বেশ সুন্দর, ভালোই লাগছিল—

দাদার আরেকটু গা ঘেঁসে বসে ভরত। এত সুন্দর গল্প বলে দাদা! যখন বাড়িতে ছিল কত গল্প বলত! পড়তে বসে, রাত্রে শুয়ে শুয়ে! আজ অনেকদিন পর এমন গা জুড়োনো রোদ্দুরে বসে গল্প শুনতে চায় ভরত।

—অমন নুড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা যায় না। পা টলমল করে, এভাবে পৌছলুম একটা ফাঁকা জায়গায়। ফাঁকা মানে একটা বড়ো পুকুরের ধারে, দেখলাম পুকুরের ঠিক ওপারে একটা পাহাড় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে। তার গা বেয়ে হু হু করে নেমে আসছে জল। আর পুকুর উপছে সেই জল বয়ে চলেছে নদী হয়ে। অনেকক্ষণ থেকে একটা আওয়াজ পাচ্ছিলুম, কিসের ঠিক খেয়াল করিনি। বুঝলুম ওটা ওই জলের আওয়াজ।

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। উবু হয়ে বসে মুখে ঘাড়ে জল দিয়ে একটু জল খেলুম, তখন আমার চারপাশে ওরা এসে দাঁড়াল। চারজনের বন্দুকই তাক করা আমার দিকে। ভয় পেয়ে গেলুম।

ওরা আমাকে নিয়ে গেল। ওই ঝরনার পাশ দিয়ে এক জায়গায় পাথরের গা বেয়ে নেমেছে মোটা একটা লতানো গাছ। মোটা মোটা শিকড় তার আঁকড়ে আছে পাথরের খাঁজে খাঁজে। তারই পাশ দিয়ে দিয়ে পাথরের গায়ে একটু একটু পাথর কেটে পা রাখার জায়গা। সেই লতা আর শিকড় ধরে ধরে ওই ধাপে ধাপে পা দিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে যাওয়া যায়। এভাবে ওরা উঠল, আমিও উঠলাম। পাহাড়ের ওপর জঙ্গল, তার মধ্যে সরু পায়ে চলা পথ, হেঁটে হেঁটে আমরা একটা ছোটো গ্রামে পৌঁছলুম।

চারপাশে ছোটো ছোটো কুঁড়ে ঘর, মাঝে অনেকটা খোলা জায়গা, সেখানে বন্দুক ছোঁড়া শিখছে কয়েকজন। আমাদের দেখে তারা ঘিরে ধরল। বলল—তোমার আর ফেরা হবে না। আজ থেকে তুমি আমাদের দলে যোগ দিলে। কি এবার গল্পটা ভালো লাগছে?—হ্যাঁ—বলল ভরত।

—ওরা বলল আমরা মুক্তির জন্য লড়াই করছি। কেন আমরা এত গরীব? কেন আমরা ভালো করে খেতে পাই না পরতে পাই না? কেন আমরা লেখা পড়া শিখতে পারি না? চিকিৎসার অভাবে কেন আমরা কুকুর বেড়ালের মতো মরে যাই? অথচ কিছু মানুষ আমাদের শোষণ করে কী বিলাসিতায় জীবন কাটায়।

খিদেটা পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে, ভরত বলল—দাদা, বড্ড খিদে পেয়েছে রে!

—আমারও—বসন্ত বলল—চল্ মুখ হাত ধুয়ে একটু জল খাই।

প্ল্যাটফর্মের টিউবওয়েলে মুখ হাত ধুয়ে জল খেয়ে এসে বসল ওরা। ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম। কাছে দূরে কেউ কোথাও নেই। কয়েকটা বড়ো বড়ো গাছ শুধু দাঁড়িয়ে ডালপালা দুলিয়ে কী সিগন্যাল দিচ্ছে তারাই জানে!

—কিছুদিন ধরে ওরা ছোটোছেলেদেরও দলে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে।

—আমি যাবো না দাদা—ভয়ার্ত গলায় বলল ভরত।

—না না, আমরা কেউই যাবো না, সেজন্যই তো পালিয়ে এলুম—বসন্ত আশ্বাসের হাত রাখল ভাইয়ের পিঠে।

জলে ক্ষুধা মেটে না! পেটটা গুলিয়ে উঠছে।

—জানিস দাদা, মুড়ির ডিবেতে চাট্টি মুড়ি আছে—ভরত বলল।

—এ্যাঁ? কোথায়?

—ঘরে।

—ও।

—কি হবে দাদা? কোথায় যাব? কি খাব? কোথায় শোবো?

—ব্যবসা করো—পাশ থেকে কে যেন বলল—ভিক্ষের ব্যবসা,—চমকে উঠল দুজনে।

সিমেন্টের বেঞ্চি পিঠোপিঠি করা, এপাশে, ওপাশেও। ওপাশে যে লম্বমান হয়ে শুয়েছিল একজন কে জানত? খুবই ভয় পেয়ে গেল বসন্ত। লোকটা সব কথাই শুনেছে মনে হচ্ছে।

উঠে বসল লোকটি। কাঁচাপাকা চুলদাড়ি রুখুসুখু চেহারা। খয়েরী রঙের একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে উঠে বসেছে। হাই তুলে তুড়ি মেরে বলল—ভিক্ষের মতো সোজা ব্যবসা আর নেই, বুঝেছ? কোনো পুঁজি লাগে না, দোকান দিয়ে বসতে হয় না, মাল গস্ত করতে হয় না। আর সব ব্যবসাতেই লাভ লোকসান আছে। কিন্তু ভিক্ষের ব্যবসাতে লোকসান বলে কিছু নেই! শুধুই লাভ!

কথাগুলো খুব নির্বিকার ভাবে বলছিল লোকটি। যেন আপন মনে।

—লেগে পড়, লেগে পড়—বসন্তর দিকে চেয়ে বলল—তুমি যোয়ান ছেলে, তোমাকে দিয়ে হবে না, লোকে ভিক্ষে তো দেবেই না উল্টে গালাগালি দেবে। কিন্তু তোমার ভাইটা ওই যে বলছিল না—বড্ড খিদে পেয়েছে দাদা!—অমনি করে বললেই হবে, শুধু নিজের দাদাকে বাদ দিয়ে জগতে যত দাদা আছে সকলকে বলতে হবে।

—তুমি দেখছি ভিক্ষের মাস্টার মশাই একেবারে—রাগ করে বলল বসন্ত।

—রাগ? এক্ষুনি যার কি খাবে ঠিক নেই—তো কাল আবার পরশু, কোথায় থাকবে কোথায় শোবে—তার আবার রাগ! বুঝতে তো পারছি যে করে পালিয়ে এসেছ ফেরার উপায় নেই, তাহলে এত রাগ কিসের?

—তা বলে ভিক্ষে?—রাগত স্বরেই বলল বসন্ত।

—তা চুরি ডাকাতি খুন-খারাবির চেয়ে তো ভিক্ষে ভালো। মানুষের জীবন নিয়ে নেওয়া? ছিঃ! ছিঃ!

—আমি খুন করিনি—ভীত বসন্ত বলল ।

—আজ করনি কাল করবে! যাক্‌গে, আমার আর কি! বাচ্ছা ছেলেটার শুকনো মুখটা দেখে মনটা কেমন করে উঠল তাই বললুম। চটজলদি হাতে কিছু পয়সা পেয়ে যেতে, খাবার কিনে ফেলতে। চুরি ডাকাতি খুনোখুনি এসব হচ্ছে অপরাধ, বুঝলে না! কিন্তু ভিক্ষের মধ্যে কোনো অপরাধ নেই। তোমার আছে আমার নেই, চাইছি, ইচ্ছে হলে দেবে না হলে দেবে না। তা ছাড়া জানতো দান করলে পূণ্য হয়, বরং ভিক্ষে নিয়ে ভিখারি লোককে পূণ্য করার সুযোগ করে দেয়।

—ভালো সব যুক্তি তৈরি করেছ ভিক্ষের জন্য।—বলল বসন্ত।

—তবে বলতে পারো ওটা একটা ওঁচা ব্যবসা, সম্মান নেই। আবার এটাই বেশ সম্মানের হয়ে যাবে যদি তুমি সাধু হয়ে যাও, মানে সত্যিকারের সাধু নয়, সাধুর বেশ ধরলেই হবে। এই দেখ না তুমি যোয়ান ছেলে যদি ভিক্ষে চাও লোকে গালাগালি দেবে বলবে খেটে খেতে পার না? কিন্তু তুমি যদি সাধুর বেশ ধরো তখন ওই লোকই বলবে বালযোগী! আহা কী জ্যোতি চেহারায়! তখন তোমাকেই ডেকে বসিয়ে মণ্ডা মেঠাই খাওয়াবে, আবার দক্ষিণা দেবে, আবার প্রণামও করবে।

হো হো করে হেসে উঠল বসন্ত, দেখাদেখি ভরতও হেসে ফেলল।

—বকবক করতে পারো বটে!—বলল বসন্ত।

—না না, আমি কি কিছু ভুল বলছি?

—না, ঠিকই বলছ, কিন্তু তুমি কি ভিক্ষে কর?

—করতাম, এখন অন্য ব্যবসা করি—ঝালমুড়ির ব্যবসা—

বেঞ্চের ওপাশে পলিথিন চাপা একটা বোঝা ছিল। পলিথিন সরিয়ে নিলে দেখা গেল ঝালমুড়ির সরঞ্জাম সাজানো একটা বোঝা। দুটি কাগজের ঠোঙায় কিছু মুড়ি তুলল লোকটি, কিছু ভিজে ছোলা ছড়িয়ে দিলো তার মধ্যে, এগিয়ে ধরল ওদের দিকে।

ভরত ইতস্তত করে দাদার দিকে তাকাল।

—আমার কাছে কিন্তু পয়সা নেই—বলল বসন্ত।

—আমি কি তোমাদের কাছে ব্যবসা করছি? নাও ধরো।

সঙ্কোচের সঙ্গে ঠোঙা হাতে নিল বসন্ত, ভরত ব্যগ্র হাতে, দ্রুত খেতে লাগল।

শূন্য প্ল্যাটফরমে দু একজন করে লোক আসতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে তিরিশ চল্লিশ জন জুটে গেল। কলরবে ভরে গেল চারিদিক। ঢং ঢং শব্দে ঘন্টা বাজল।

—অনেক বকবক করলাম, আসলে গল্প করবার লোক পাইনাতো! আমার সঙ্গে কে কথা বলবে বলো!

—তোমার কেউ নেই বুঝি? জিজ্ঞাসা করল বসন্ত।

—নাঃ! মা ছিল, সেও গত হয়েছে ক-বছর। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে—গাড়ী আসছে, চলি—বোঝা কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে নিল।

রেলগাড়ির বাঁশি শোনা গেল। মানুষজন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

—চললুম—ভরতের চিবুকে আলতো আঙুল ছোঁয়াল, এগিয়ে গেল।

তিন

ট্রেন চলে গেছে, কুড়িয়ে নিয়ে গেছে প্লাটফরমের লোকজন। এখন আবার সুনসান ফাঁকা স্টেশন। আবার সেই দীর্ঘ গাছেরা শাখা দুলিয়ে দুলিয়ে কী যেন সিগন্যাল দিচ্ছে। সোঁ সোঁ কেমন এক শব্দ বাতাসে। লাইনের ওপারেও প্লাটফরম, তার ওপারে ঢালু জমিন, রেলের দুটি কোয়ার্টার, তারপর দিগন্ত বিস্তৃত শূন্য মাঠ, ওই দূরে সবুজ গাছপালা আর গ্রামের আভাস। শিরশিরিয়ে বইছে উত্তুরে ঠান্ডা বাতাস, তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠছে রোদ্দুরে।

সিমেন্টের বেঞ্চে ভরা রোদ্দুরে পা ছড়িয়ে সোজা হয়ে শুয়েছে ভরত, ঘুমিয়ে পড়েছে। স্নেহার্দ বসন্ত কাঁথাটা ভাঁজ করে ওর মাথার নিচে গুঁজে দিল।

সোয়েটারটা গা থেকে খুলে ফেলল বসন্ত। এটা দলের কাছ থেকেই পাওয়া। রোদ্দুরের তাপ বড়ো ভালো লাগছে। এমন রোদ্দুর গায়ে মেখে ওই বিস্তীর্ণ মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যদি চলে যাওয়া যেত ওই সবুজ গ্রামের দিকে ...! হয়ত আর পাঁচটা গ্রামের মতোই সাধারণ গ্রাম—তবু বসন্তের এরকম মনে হলো। ভরতের মতো যখন সে ছোটো ছিল তখনই তার এমন কত রকমের ইচ্ছা হতো। ছুটির দুপুরে তাদের গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে পদ্মপুকুরের ধারে বসে সে কাটিয়ে দিত ক-ত-ক্ষ-ণ। ওই জল, ওই পদ্মপাতা, ওই কমলকলি আর ফোটা ফুলগুলি, ছোটাছুটি করা জলপোকারা—সব কিছুর মধ্যে কী এক রহস্য, আর সেই রহস্যের মধ্যে কী এক নিবিড় আনন্দ অনুভব করত সে। কোনো অলস মধ্যাহ্নে তাদের বাড়ির পিছনে আমগাছের নিচে বসে বেড়ার ধারে সজনে গাছের পাতা ঝরা দেখতে দেখতে আর ঘুঘুর ডাক শুনতে শুনতে তার মনের মধ্যে কী যে ভালোলাগা গাঢ় হয়ে উঠত!

লেখাপড়ায় বেশ ভালো ছিল বসন্ত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলীপবাবু বড়ো ভালোবাসতেন তাকে। খুব সহজেই সে ক্লাসের অঙ্ক কষে ফেলত, বরং সে অবাক হয়ে ভাবত এই সহজ জিনিসটা কেন সবাই বুঝতে পারে না! বড়ো হয়ে সে অবশ্য বুঝেছে—এটাই মেধা। হেড মাস্টার মশাই বসন্তর বাবাকে ডেকে বলতেন—ছেলেটার পড়াশুনা বন্ধ কোরো না। ওকে বড়ো স্কুলে ভর্তি করে দিও। ও অনেক দূর এগোতে পারবে। একটু কষ্ট করে না হয় সংসার চালাবে! হোস্টেলে থাকার খরচ—আমার চেনাশোনা আছে, ধরে করে অর্ধেক করে দিতে পারব।

হেডস্যারের চেষ্টায় এভাবে যে আধাশহরের এক হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল। বই পড়ার মধ্যে যে কি আনন্দ আছে তখনই এটা অনুভব করেছিল সে। স্কুলের লাইব্রেরীতে

কত বই! পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও বই পড়ায় তার কোনো ক্লান্তি ছিল না। আসলে ছাপা কিছু পেলেই তার পড়ে ফেলতে ইচ্ছা করে। খবরের কাগজেও ছিল তার নেশা। হোস্টেলে সুপারের ঘরে একটা কাগজ আসত। বড়ো ছেলেরা খেলার খবর নিয়ে খুব মাতামাতি করত। তার ওপর হুকুম ছিল সুপারের ঘর থেকে কাগজ আনার। সুপার অবশ্য চাইলেই দিয়ে দিতেন, কিন্তু সাবধান করতেন—চটকে মটকে ছিঁড়ে মিঁড়ে আনবে না।

সুপার ওরকমভাবে বলতেন। তার হাসি পেত, লুকিয়ে হাসত। ফেরৎ দিয়ে আসার আগে সে কাগজটা উল্টে পাল্টে অনেকটাই পড়ে ফেলত। কি আনন্দের ছিল সেইসব পড়াশোনা—খেলাধুলার দিন ...

.... ওইটুকু গ্রাম তাদের—যেখানে সামান্য বিদ্যুৎটুকুও নেই, সড়কপথ সামান্য, রেলপথ অনেকদূর ... সেখান থেকে ওই আধা শহরে এসে হাইস্কুল আর হোস্টেলই তার কাছে কত বড়ো জগৎ! এর চেয়ে অনেক অনেক বড়ো আর সমৃদ্ধ শহর সারা দেশ জুড়ে... তাদের ছবি, সংবাদ... দেশ ছাড়িয়ে আরও দূরে আরও কত বিস্ময়কর দেশ ... কত উন্নত শহর ছড়িয়ে আছে পৃথিবী জুড়ে। খবরের কাগজের মাধ্যমে সে যেন সেই সবের খুব কাছাকাছি চলে যেত! তার স্বপ্নগুলি অবাধ ডানা মেলছিল—অনেক অনেকদূর এগোবে সে...!

কিন্তু সে বুঝতে পারেনি তার খরচ চালাতে গিয়ে সংসারটা নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। দশম শ্রেণীতে উঠে যখন সে হঠাৎ জানল বাবা জমি বিক্রি করতে চলেছে—সে কঠিন মাটিতে যেন মুখ থুবড়ে পড়ল—এই সামান্য জমি—এটুকু সম্বল—তার খানিকটা চলে গেলে কি হবে? সব স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে সে বাড়িতে চলে এলো। কিন্তু দিশাহীন জীবনে কি যে করবে কোনো ঠিক নেই ... সে তার মনকে বেঁধেছে সীমাবদ্ধতায়। মাঝে মাঝে পুরোনো বইগুলি নিয়েই বসে বসে পড়ত— মাধ্যমিকের বই সব, এভাবে বেকার কেটে গেছে কটা বছর। তারপর হঠাৎ কী যে ঘটল—সে পড়ল গিয়ে বিদ্রোহীদের দলে। ওদের ক্ষোভ ওদের বক্তব্য তার মধ্যে নাড়া দেয় না যে তা নয়, কিন্তু ওদের পথ তার মন মেনে নিতে চায় না। দেশটা অনেক বড়ো, পৃথিবী আরও বড়ো, এই জঙ্গলের মধ্যে এই কর্মপদ্ধতিতে কতটুকু এগোনো যাবে? তা ছাড়া অন্যায়ের প্রতিকারের এই কী পথ? এই রক্তাক্ত পথ—এ কাদের রক্ত!

শিউরে উঠল বসন্ত—রক্তাক্ত স্মৃতি তাকে অস্থির করে তুলছে বারবার। দিলীপস্যারের সেই করুণ কণ্ঠস্বর—কি অকৃতজ্ঞ ভেবে চলে গেলেন। এভাবে। উঃ স্যার, বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে মারতে যাইনি। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। এভবে শোষণ মুক্তি ঘটবে?

প্লাটফর্মে এবার এসে জড়ো হচ্ছে পড়ুয়া ছেলেমেয়ের দল। সবাই প্রায় বসন্তর বয়সী। এরা কলেজের পড়ুয়া মনে হয়—ভাবল বসন্ত। তার সামনের দিকে যদিও বিস্তীর্ণ চাষের মাঠ কিন্তু পিছন দিকে স্টেশন থেকে চলে গেছে পথ—কিছুটা চাষের জমি পেরিয়ে তারপর দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। ওখানের ছেলেমেয়েরাই চলেছে কোথাও কলেজে

পড়তে! ওদের পরিচ্ছন্ন বেশবাস, উজ্জ্বল চেহারা, বইখাতা, ব্যাগ—সবকিছু দেখতে দেখতে আর ওদের কলকাকলি শুনতে শুনতে বসন্তর মনে বিষাদ—সে মুখ ফিরিয়ে নিল ভায়ের দিকে। একটু পরেই ও জেগে উঠবে। ক্ষুধা ওকে জাগাবে। তারপর?

.... মা, আমি তোমার জন্য চাষ করে ঘরে আনতে পারিনি ফসল! চেয়েছিলাম আমাদের সামান্য জমিতেই বাবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফলাবো আরও ফসল। শুধু ধান নয়, ধান হয়ে গেলে অল্প জলে আরও কোনো ফসল—ছোটু নদী থেকে বহে আনব জল, বাবা, আমি, ভরতও না হয় মাঝে মাঝে একটু হাত লাগাবে ...

... মা এখন তুমি কোথায় কী যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছ। মা, আমার জন্য তোমার এই দুর্ভোগ। তোমার জন্য কিছুই করতে পারলাম না, শুধুই কষ্ট দিলাম।

বেলা দুপুর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ রোদে থেকে গরম লাগছে। ভরত উঠে পড়ল। ওর শুকনো মুখ দেখলে বোঝা যায় খুব খিদে পেয়েছে ওর। কিন্তু মুখে কিছু বলছে না।

—চল একটু জল খাই—বলল বসন্ত—জল খেয়ে ওই শেডের নিচে ছাওয়ায় গিয়ে বসি।

জল খেয়ে শেডের নিচে এক কোণে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল দুজন। শরীর আর বইছে না। ভরত কেমন নেতিয়ে পড়েছে। বেঞ্চে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

দুপুর গড়িয়ে গেল বিকেলের দিকে। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে আবার। এই শেডটার উত্তর দিকটা ঘেরা, তাই সোজাসুজি ঠাণ্ডা হাওয়াটা লাগছে না।

মন্দের মধ্যে এটুকু ভালো! ভাবল ভরত— এখানেই রাত কাটাতে হবে। সোয়েটারটা গায়ে দিয়ে নিল, কাঁথাটা জড়িয়ে দিল ভরতের গায়ে। কিন্তু কিভাবে কাটবে রাত? তারপর? সকাল হলে? তার চেয়ে বরং জিজ্ঞাসা করে খুঁজে দেখা যাক থানাটা কোথায়। কাউকে জিজ্ঞাসা করলে হয়—সেখানে গিয়ে আত্মসমর্পণ—মা ভাই অন্তত বাঁচুক।

দুপুরের দিকে ট্রেন প্রায় ছিলই না, এখন আবার ট্রেন। ঘরে ফিরছে সবাই। সেইসব ছেলেমেয়েরা—যারা পড়তে গিয়েছিল, সেই সব মানুষেরা—যারা কাজে গিয়েছিল।

এই শেডের ভিতর দিয়েই বাইরে যাবার পথ। আধখোলা চোখে মানুষজনের যাওয়া আসা দেখছিল বসন্ত, কিংবা দেখছিল না, শুধুই তাকিয়েছিল।

—এখানেই বসে আছ সারাদিন?

বসন্ত চোখ খুলে তাকাল—সামনে দাঁড়িয়ে সকালের সেই মানুষটি! একি দেবদূত! ভাবল বসন্ত, তার মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা সুক্ষ্ম আশা জেগেছিল, এরই আসার অপেক্ষায় ছিল যেন মন।

—খোকা ও খোকা—ভরতের মাথায় হাত দিয়ে ডাকল লোকটি, ভরত ধড়ফড় করে উঠে বসল।

—এঃ ছেলেটা দেখছি একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে—বলল লোকটি— তোমারও অবস্থা দেখছি ভালো নয়, চল চল আমার সঙ্গে, ওঠো।

ওরা দুজন কোনো প্রশ্ন না করে ওকে অনুসরণ করল।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে সোজা যে রাস্তাটি চলে গেছে অদূরবর্তী গ্রামের দিকে—

সেদিকে না গিয়ে লোকটি বাঁদিকে নেমে গেল, মাটির ওপর সরু পায়ে চলা একটি পথরেখা ধরে এগিয়ে চলল। বাঁ পাশে ওই উঁচুতে প্লাটফরমের রেলিং, রেললাইন।

—সারাটা দিন পেটে কিছু পড়েনি! হায় হায় হায়! এরপর আবার রাত আসছে! বকবক করতে এগিয়ে চলল লোকটি, পিছনে দুই ভাই।

একটু হেঁটেই ওপরের স্টেশন এলাকা, প্লাটফরমের রেলিং এসব শেষ হয়ে গেল, তারপর আরও একটু এগিয়ে একটা কুঁড়ে ঘর, সামনে একটু দাওয়া, কিছু খড় কিছু হোগলা দিয়ে ছাওয়া চাল। একটা কুল গাছ ডালপালা বিছিয়ে আছে ঘরের সামনে, পিছন থেকে ঝুঁকে আছে একটা জামগাছ। রেলপথের ওপারে সূর্যের শেষ রশ্মি ছুঁয়ে আছে ঘরের চালা। এ যেন ছোট্ট পাহাড়ের কোলে ছোট্ট কুঁড়ে ঘর! সামনে একটু তফাতেই শুরু হয়েছে ঝিল, ঢালু পাড়ের নিচে জল, উত্তুরে হাওয়ায় তিরতিরিয়ে বইছে স্রোত।

মাথা নিচু করে দাওয়ায় উঠল লোকটি, হাতের মালপত্র নামিয়ে রেখে পকেট থেকে চাবি বার করে বাঁশবাখারির দরজার তালা খুলল। প্লাস্টিকের চটিটা দুয়ারের এক ধারে খুলে রেখে ঘরে ঢুকল সে, ঘরে খুটখাট কী যেন করে বেরিয়ে এল একটা এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি নিয়ে, তাতে কিছু চাল আর আলু, আরেক হাতে দুটো জলের বোতল নিয়ে। চাল আলু ধুয়ে দুয়ারের একদিকে ইট মাটি দিয়ে গড়া উনুনে হাঁড়ি বসাল। পাশে জড়ো করা শুকনো ডালপালা উনুনে গুঁজে একটা বস্তা থেকে এক মুঠো শুকনো পাতা নিয়ে গুঁজে দিল, তারপর দেশলাই জ্বেলে দিল। মুহূর্তে শুকনো পাতা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। হাঁড়ির মুখে একটা থালা চাপা দিয়ে যেন হাঁফ ছাড়ল।

—নাও, এবার দোরে উঠে বসো।

ঘর থেকে একটা হোগলার চ্যাটাই বার করে আনল, দুয়ারে পেতে দিল।—উনুনে একটু ডালপালা গুঁজে দিও, আমি হাত মুখ ধুয়ে আসি।

ঘরে ঢুকে গায়ের চাদর খুলে রেখে একটা গামছা নিয়ে নেমে গেল ঝিলের দিকে।

বসন্তর পায়ে জুতো, ভরতের খালি পা, দুজনে দোরে উঠে বসল, জুতো খুলল বসন্ত। দুর্বল ভরত দেওয়ালে হেলান দিল। বসন্ত উনুনে জ্বাল দিচ্ছে। আগুনের তাপে বাতাস বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, ভরত একটু এগিয়ে বসল, একটু চাঙ্গা হয়ে উঠল সে।
—আলো থাকতে থাকতে হাত মুখ ধুয়ে এসো—ফিরে এসে বলল লোকটি। গামছাটা বাড়িয়ে দিল। দুভাই নেমে গেল নীচে।

রেলের দুটো বাতিল স্লিপার ফেলে দিব্যি ঘাট বানানো হয়েছে। কী ঠাণ্ডা জল! হাত পা মুখ ধুয়ে বেশ তৃপ্তি লাগল ওদের। ফিরে এসে বসল দুয়ারে। ফুটন্ত ভাতের বাস উঠেছে—বুক ভরে গন্ধ নিল ভরত। তার আর তর সইছে না!

—দুটোর বেশি থালা নেই তোমরা আগে খেয়ে নাও, আমি পরে খাবো—বলল লোকটি, ভাত বেড়ে দিল। গরম ভাতে হাত রাখল ভরত, বড্ড গরম! কিন্তু বড়ো ভালো লাগছে! এমন গরম ভাত আর আলুভাতে! আহ্!

—দাঁড়াও তোমাদের একটা জিনিস দিই—বলতে বলতে ঘরে ঢুকে একটা শিশি আর একটা পাতিলেবু আনল লোকটি, লেবু কেটে দিল, আর শিশি থেকে একটু ঘি

ছড়িয়ে দিল ভাতে। নুন দিল। খেতে খেতে চোখে জল এসে গেল বসন্তর।

খাওয়ার পর শোওয়া। ঘরের মধ্যে দুপাশে দুটো বাঁশের মাচা, একটাতে টুকিটাকি নানা জিনিসপত্র আর কতগুলো জলের বোতল। রেলগাড়িতে জলের যত খালি বোতল পায় সে কুড়িয়ে নিয়ে আসে, জল ভরে রাখে। আরেকটা মাচায় খড় বিছিয়ে তার ওপর চট বিছিয়ে তার ওপর একটা কম্বল পেতে বিছানা বানিয়েছে সে, একটা ছাপা চাদরও পেতেছে।

—শুয়ে পড়ো ওখানে—

—তুমি কোথায় শোবে—জিজ্ঞাসা করল বসন্ত।

—এটাতে ব্যবস্থা করে নিতে হবে—অপর মাচা থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে নিচে রাখতে লাগল সে।

—কিন্তু—

—শুয়ে পড়—আদেশের সুরে বলল লোকটি। পিছন ফিরে জিনিসপত্র নামিয়ে মাচার নিচে রাখছে লোকটি— দেখল বসন্ত, এ পাশে ভরত গড়িয়ে পড়েছে বিছানায়— ছোটো জায়গা, কিন্তু তাদের কাঁথাটাও তো বেশি বড় নয়! দুজনে ঘেঁসাঘেঁসি শুয়ে পড়ল।

ঘুম, ঘু-ম, ঘু-উ-ম নামছে চরাচরে ...

চার

নাম তার পরাণ দলুই। দলুই যে তার বাবার পদবী তা নয়। ওটা তার মায়ের দেওয়া পদবী। মাও আবার নিজের মা নয়—পালিকা মা। আসলে সে এক মাতৃপিতৃ পরিচয়হীন অনাথ। ছোটোবেলার কথা যতটুকু মনে পড়ে তার—সে একটা বড়ো রেলস্টেশন চত্বরে ঘুরে বেড়াত, লোকের কাছে হাত পাতত, কখনও কিছু পেত কখনও শুধুই খ্যাদানি। কোনোদিন খাবার জুটত, কোনোদিন শুধুই জল। পেট ভরে খাবার কখনই হত না। যেখানে পারত শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। এক একদিন ভিক্ষের পয়সা কেড়ে নিত অন্য কোনো শক্তিধর ভিখারি—তখন কাঁদত।

এই কেড়ে নেওয়া ব্যাপারটা ক্রমশ এত ঘন ঘন হতে লাগল যে তার সামান্য কিছু খাবার জোগাড় করাও কঠিন হয়ে উঠল। এভাবে একদিন সে ক্ষোভে দুঃখে কাতর হয়ে লুণ্ঠনকারীকে আক্রমণ করল। লুণ্ঠনকারী শক্তিধর, সে তাকে বেধড়ক মারতে লাগল। মার খেতে খেতে সে যখন প্রায় অচেতন তখন তাকে উদ্ধার করে এক ভিখারিনী— দুখুবালা। কোথা থেকে ছুটে এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুখুবালা তাকে উদ্ধার করে, তারপর তার পুঁটুলি থেকে একটা স্টিলের গেলাস বার করে দুধ আনে, আর পাঁউরুটি, নিজে পাঁউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দুধে ভিজিয়ে তাকে খাওয়ায়। এই দৃশ্যটা ছবির মতো আঁকা আছে পরাণের মনে।

দুখুবালা রেলগাড়িতে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করত। এই স্টেশনের দুটো স্টেশন আগের

স্টেশনের নাম পলাশপুর, ওই স্টেশনের রেলশেডের এক কোণে ছিল তার পোঁটলা পুঁটলি আর তিনটে ইঁটের উনুন। দুধ পাঁউরুটি খাইয়ে হাওড়া স্টেশনের চত্বর থেকে পরানকে নিয়ে ট্রেনে চেপে ওই পলাশপুরে এনে তুলেছিল। সেখানে সিমেন্টের মেঝেতে বড়ো শান্তিতে ঘুমিয়েছিল বালক পরান। ঘুম থেকে উঠেই আবার খিদে! পরান বলেছিল—মা, খিদে পেয়েছে। আসলে মা সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিল না। কাউকে কাউকে ডাকতে শুনেছে—এই মাত্র। সে ধরে নিয়েছিল এরকম কাউকে 'মা' ডাকতে হয়। কিন্তু ওই ডাক দুখুবালার মন উদ্বেল করেছিল, আকুল হয়ে বলেছিল—হা রে আমার পরাণ!

সেই থেকে ওই পরাণ নামটাই বহাল হয়েছিল, আর দুখুবালার পদবী নিয়ে পুরো নাম হয়েছিল পরাণ দলুই। শুরু হলো মায়ে ব্যাটায় ভিক্ষে। একদণ্ড পরানকে কাছছাড়া করত না দুখুবালা। আয় বাড়ল। এমনিতেই পরানের দুর্বল চেহারা তার ওপর দুজনের করুণ আর্তি—মায়ে ব্যাটায় মিলে বেশ একটা করুণ দৃশ্যপট!

সকালবেলা জল দেওয়া ভাত, একটু আলুসেদ্ধ আর কাঁচা পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে পেট ঠাণ্ডা করে মায়ে ব্যাটায় বেরিয়ে পড়া—তারপর সারাদিন রেলগাড়ী ঝমাঝম! কত রকমের লোক, কত রকমের হকার, কত সব মন ভোলান জিনিস বিক্রি করে, কত রকমের খাবার বিক্রি করে—ও মা, এটা কিনে দে! ওমা ওটা কিনে দে! পরাণের একটা চাকার মতো লাট্টুর কথা খুব মনে পড়ে—অনেক রঙের মধ্যে সবুজ রঙেরটা পছন্দ করেছিল সে, কালো রঙের সুতো বাঁধা, ঘুরতে ঘুরতে ছুটে যেত আবার ঘুরতে ঘুরতে ফিরে আসত হাতের মুঠোয়। এই দৃশ্যটা পরাণ এই বয়সেও মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখে।

সন্ধ্যাবেলায় ফেরার সময় স্টেশনের কাছেই বাজার থেকে চাল টাল কিনে নিয়ে এসে ভাত চাপিয়ে দিয়ে স্টেশনের কলে চান। এক একদিন মাছও কিনত দুখু, মাছের ঝাল রাঁধত। পেটে তখন খিদে ছুঁচোর মতো ক্যাঁচকেঁচিয়ে ছুটোছুটি করছে। তাড়াতাড়িই খেয়ে নেওয়া হতো। এক একদিন এক একটা তরকারি রাঁধত দুখু। রাতে যখন বাজার উঠে যাওয়ার মুখে তখন বাজারে গিয়ে এটা ওটা আনাজ চেয়ে আনতে যেত দুখু। পরাণ তখন বেঞ্চে বসে বসে ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ে যাওয়ার উপক্রম। দুখু এসে চট আর জীর্ণ কাঁথার গুটিয়ে রাখা বিছানাটা পেতে ডাকত—আয় বাবা পরাণ—

সকালবেলা আবার পান্ত খেয়ে শান্ত হয়ে পোঁটলাপুঁটলির ঘরসংসার গুছিয়ে একটা প্লাস্টিকের বড়ো চাদর ঢেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তার ওপর গুণে গুণে দশটা ইট চাপা দিয়ে বেরিয়ে পড়া। দুখুর বগলে একটা পুঁটুলি, পরাণের হাতে একটা ব্যাগ—মা গো, বাবা গো—দুখিনিকে একটু দ্যাখো গো—

স্টেশনের প্লাটফরমে বড়ো বড়ো গাছের নিচে সিমেন্ট বাঁধান বেঞ্চ, সেখানে যাত্রীরা আসে বসে চলে যায়। শেষ প্রান্তের একটা বেঞ্চে বিকালবেলা রোজই এসে বসতেন এলাকার কয়েকজন বৃদ্ধ, আড্ডা দিতেন। তাঁদের কেউ ঘোষ মশায়, কেউ বোস মশায়, তার মধ্যে একজনকে সবাই ডাকত মাস্টারমশায়। স্টেশনের বাইরেই একটা ছোটো মাঠ, তার ওপারেই ছিল ওনার বাড়ি। সন্ধ্যা হয়ে এলে সবাই চলে গেলেও উনি

অনেকক্ষণ একলা বসে থাকতেন, তারপর একসময় উঠে আস্তে আস্তে মাঠ পেরিয়ে বাড়ি চলে যেতেন। এসব রোজই দেখত দুখু, একদিন সে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল। মাস্টার মশায় অবাক হয়ে বললেন—তুমি তো ওইখানটায় থাক?

—হেঁ।

—হঠাৎ প্রণাম করছ কেন?

—আপনাকে একটা কথা বলব মাস্টারমশাই?

—বল না।

—বড়ো ভয় করে বাবা!

—কি এমন কথা যে ভয় করে বলতে?

—আমার ছেলেটা যদি একটু লিখতে পড়তে শিখত!

অবাক হয়ে একটু চেয়ে রইলেন মাস্টারমশাই, তারপর বললেন—তা কী বলছ? তোমার ছেলেকে আমি পড়াব?

—যদি দয়া হয়! সন্ধ্যেবেলা আপনি তো এখানে বসে থাকেন যদি একটু—

—এখানে?—মাস্টার মশাই একবার ওপর পানে চেয়ে ল্যাম্পপোস্টের আলো দেখলেন, বললেন—আচ্ছা দেখি—

পরদিন সন্ধ্যায় সবাই চলে গেলে মাস্টারমশাই ডাকলেন—কই মেয়ে তোমার ছেলে কোথায়?

পরাণ তখন প্লাটফরমের ধারে দাঁড়িয়ে চাকা লাট্টু ঘোরাচ্ছে। লাট্টুটা ঘুরতে ঘুরতে নেমে যাচ্ছে রেললাইনের কাছে, আবার হাতের টানে চলে আসছে মুঠোর মধ্যে, মায়ের ডাকে গুটি গুটি কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মাস্টার মশাই বললেন—বোসো এখানে, তোমার নাম কি?

সেই প্রথম পরাণকে কেউ নাম জিজ্ঞাসা করল।

—পরাণ—ভয়ে ভয়ে বলল সে।

—পরাণ কি?

পরাণ অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। দুখু বলল—দলুই, পরাণ দলুই। সেই প্রথম পরাণ জানল নামের পিছনে আরও একটা কিছু থাকে।—দলুই—দ-লু-ই—দুবার বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল সে।

—প্রণাম কর, উনি মাস্টার মশাই—দুখু বলল। পরাণ আবারও অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল, দুখু বলল—ওনার পায়ে হাত দিয়ে সেই হাতটা নিজের মাথায় বুলিয়ে নে। পরাণ সেরকম একটা কিছু করল।

মাস্টার মশাই আবার তাকে বললেন—এইখানে বেঞ্চে উঠে বসো। পকেট থেকে একটা পাতলা বই বার করে খুললেন, পরাণের সামনে বইটা রেখে আঙুল দিয়ে দিয়ে বললেন—অ, আ, ই, ঈ—এইগুলো কোনটা কেমন দেখতে ভালো করে চেনো, আজ শুধু চারটে, সব সময় সারাদিন মনে মনে বা জোরে জোবে বলবে—অ, আ, ই, ঈ—বলো—।

এই দৃশ্যটা পরাণের ঠিক মনে আছে, মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে, তখন পরাণ কেমন আনমনা হয়ে যায়। আনমনে বলে অ আ ই ঈ।

এভাবে কদিন, তারপর আরও চারটে অক্ষর—একদিন একটা শ্লেট আর খড়ি পেন্সিল এনে দিলেন, ছোটো ছোটো রেখা টানতে শেখালেন, গোল গোল রেখা টানতে শেখালেন, তারপর অক্ষর লেখা!

এক একদিন দুখু এসে দাঁড়িয়ে দেখত। মাস্টার মশাই একদিন বললেন—শেষ বয়সে একটা ভালো কাজ দিয়েছ মা। সারা জীবন কত ছাত্র পড়ালাম কিন্তু এমন ছাত্র!

তখন লোকে ভিক্ষে দিত এক পয়সা দু পয়সা। সেই পয়সা জমিয়ে জমিয়ে দোকানদারদের থেকে টাকা করে আনত দুখু। তারপর একটাকা একটাকা করে দশ টাকা জমলে—দশ টাকার নোট করত। এভাবে বেশ কিছু টাকা জমিয়েছিল দুখু। তার বগলের পুঁটুলিতে সে টাকা থাকত। ওটা কোনোদিন রেখে যেত না। একদিন মাস্টার মশায়কে বলল—বাবা, আমার কতগুলো টাকা আপনার কাছে রাখবেন? ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করি, কখন কী হবে কেউ হয়ত কেড়ে নেবে।

—তুমি টাকা জমিয়েছ? মাস্টার মশাই অবাক,—কত টাকা?

—সে তো আমি গুনতে জানি না।

—কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ, কবে বলতে কবে মরে যাব তোমার টাকার তখন কী গতি হবে? তার চেয়ে এক কাজ কর, পোস্ট অফিসে তোমার আর তোমার ছেলের নামে খাতা কর। ওখানেই জমাবে, আমি ব্যবস্থা করে দেব।

পরাণ তখন নাম লিখতে শিখে গেছে, স্টেশনের অদূরেই পোস্ট অফিস, মাস্টার মশাই নিয়ে গিয়ে সব করে দিলেন।

এই দিনটিও পরাণের মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এখনও মাঝে মাঝে সে পলাশপুর পোস্ট অফিসে টাকা জমা দিতে যায়। তখন সেই দিনটির কথা মনে পড়ে।

চার বছরে অনেকটা লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন মাস্টার মশায়, তারপর হঠাৎ একদিন চলে গেলেন। সে এক সকালবেলা—ঘুম থেকে উঠে পরাণ আর পরাণের মা দেখল মাস্টার মশায়ের বাড়ির সামনে মানুষের ভীড়। ওরা মাঠ পেরিয়ে পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল, শুনল শেষ রাতে মাস্টার মশায় মারা গেছেন। সেদিন আর পান্তা খাওয়া হল না। সেদিন আর ভিক্ষেয় যাওয়া হল না। সেদিন শবযাত্রার সকলের পিছনে পরাণের হাত ধরে হেঁটেছিল পরাণের মা। দুজনে খুব কেঁদেছিল।

মাস্টার মশাই মারা যাওয়ার পর পরাণের সন্ধ্যাগুলো একেবারে ফাঁকা! যত খুশি খেলা কর! কিন্তু পরাণের খেলতে ভালো লাগত না। সে পুরোনো ছেঁড়া বইগুলো নিয়েই সন্ধ্যাবেলা বসে নাড়াচাড়া করত, খাতায় হাতের লেখা করত। লিখতে লিখতে একসময় উদাস হয়ে চুপ করে বসে থাকত। একসময় মা এসে ডাকত— পরাণ, খাবি আয় বাবা।

একদিন মা বলল—পরাণ, আমাদের একটা কুঁড়ে তৈরি করব ভাবছি।

—খুব ভালো হবে মা,—পরাণের খুব উৎসাহ, কোথায়?

—একটা জায়গা দেখেছি, রেলগাড়িতে যেতে আসতে—চল একদিন।

একদিন মায়ে ব্যাটায় রেলগাড়ি থেকে নেমে পড়ল রাণীঝিল স্টেশনে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে এসে দাঁড়াল এই ঝিলের ধারে।

—রেলের জমি, রেলের ঝিল, এখানে একটা ঝুপড়ি করলে বেশ হয়। রেলের কত জায়গায় কত লোক তো ঝুপড়ি করে আছে। কত জায়গায় দোকানপাট করে ফেলেছে। দরকার না পড়লে রেলকোম্পানী তুলে দেয় না।

একটা কাটারি কিনল দুখুবালা। সেই কাটারি আর চারটে হাত সম্বল—ঝিলের ধার থেকে তাল তাল মাটি তুলে এনে রেললাইনের ঢালের নিচে বেশ খানিকটা জায়গা উঁচু করে সমান করা হয়ে গেল।

—জাত ঘরামির মেয়ে আমি,—মাটি তুলতে তুলতে বলত দুখু—ছোটোবেলায় কত ঘর তৈরি করতে দেখেছি বাবাকে। চালে খড় ছাইতে বাবার মতো পাকা লোক আর তল্লাটে ছিল না রে। বাঁশ কাটা, বাঁশ ফেড়ে বাখারি করে চেঁচে ছুলে কী পরিস্কার চাল যে তৈরি করত! আমার সোয়ামীও ছিল ঘরামি রে—কেমন ঝিমানো গলায় বলল দুখু—মুণ্ডেশ্বরীর বানে আমার সব গেল, ঘর গেল সোয়ামী গেল ... আমি ভিকিরি হয়ে গেলাম।

কাজের হাত দুটো মাটি তুলতে তুলতে থেমে গিয়েছিল। পরাণও অবাক হয়ে কাজ থামিয়ে চেয়েছিল মায়ের দিকে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলল—নে নে, হাত চালিয়ে নে—

গ্রাম থেকে কাকুতি মিনতি করে সামান্য কিছু দাম দিয়ে খানচারেক বাঁশ কিনেছিল দুখু। কী পরিশ্রম করে যে সেগুলি দুজনে টেনে টেনে নিয়ে এসেছিল! কেনা বলতে ওইটুক, আর কিছু দড়ি পেরেক, বাকি সব জোগাড় করা। ঝিলের ধারে কত রকমের গাছ গাছালি, জল ঘাস আর হোগলার বন।

বাঁশ কেটে কাঠামো হয়েছিল, কঞ্চি আর নানান গাছের ডালপালা বেঁধে বেঁধে

বেড়া দিয়ে দিয়ে দেওয়াল। বেড়ার এপাশে দুখু, ওপাশে পরাণ। এপাশ থেকে দড়ির মুখ ওপাশে গলিয়ে দিত দুখু, সেই দড়ির মুখ পরাণ ঘুরিয়ে আবার গলিয়ে দিত ওপাশে। এভাবে বেড়ার বাঁধন দেওয়া—খুব মজা লাগত পরাণের।

চারটে দেওয়াল তৈরি হয়ে গেল, মাঝে ফোকর রেখে জানলা। সামনে দরজার ফাঁক। সেই বেড়ার ওপর কয়েক পলেস্তারা মাটি ধরিয়ে কেমন দেওয়াল হয়ে গেল। হোগলা আর জলঘাস কেটে শুকনো করে আর কিছু খড় চেয়েচিন্তে এনে ছাউনি দিয়ে দিব্যি কুঁড়ে ঘর তৈরি হয়ে গেল। ঘরের সামনে একটা কুলগাছ আপনিই হয়েছিল। আর পিছনে জাম আর পেয়ারা গাছ লাগিয়েছিল দুখু, কত বছর ধরে সেগুলি বড়ো হয়েছে। পিছনে আর একটু তফাতে লাগিয়েছিল কাঁঠালি কলার গাছ। রেলের বাতিল স্লিপারের কাঠ টেনে এনে ঝিলের ধারে ঘাট, সেসব কতদিনকার কথা!

পাঁচ

ভোর। তীব্র শীতে যেন জমে আছে চরাচর। পূবের আকাশে সামান্য রঙ ধরেছে। শিরশিরিয়ে বইছে উত্তুরে বাতাস। এ বাতাসের দাপট নেই কিন্তু কামড় আছে, হাড়ের ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা অভ্যাস বসন্তর। সেই হোস্টেলের জীবনেও এবং জঙ্গলের শিবিরেও। শিবিরে তো নিয়মিত প্যারেড করতে হতো।

ঝিলের ধারে বসেছিল বসন্ত, মুখ টুখ ধোওয়া হয়ে গেছে। দূরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসেছিল সে। জায়গাটা মনোমুগ্ধকর। জলঘাস, হোগলাবন—এইসব অলঙ্কার তীরে তীরে সাজিয়ে মাঝে বিস্তীর্ণ জলাশয়। ওই ওপারে গাছগাছালি জমাট সবুজ, মাঝে মাঝে এক একটা পাতা ঝরা গাছের হলদে হয়ে যাওয়া রঙের ছোপ—যেন কোথাও কোনো জনবসতি নেই। দু একটা বক এখান থেকে ওখানে উড়ে বসছে।

ওই সূর্য উঠল। আলো ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশ কী নীল!

ঘাটের কাছে একটা মাছ বোধহয় ঝটকা দিচ্ছে—তারই শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, বৃত্তাকার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে জলে—মিলিয়ে যাচ্ছে।

খুসখাস পদশব্দ পিছনে—মুখ ফিরিয়ে তাকাল বসন্ত। একগোছা কলমি শাক হাতে নেমে আসছে আশ্রয়দাতা। এই শান্ত সকালে মানুষটির দিকে তাকিয়ে বসন্তর মন কেমন শুচিস্নিগ্ধ অনুভবে ভরে গেল। কাঁচা পাকা চুলদাড়িতে মানুষটিকে সাধুর মতো দেখায়, তার সঙ্গে ওর মুখের শান্তভাব—এত ভালো লাগল বসন্তর। চোখে চোখ পড়তে হাসল বসন্ত।

—ঘুম হয়েছিল?

—খুব ভালো।

—তোমার ভাই এখনও ওঠেনি?

—না।

—আমার নাম পরাণ, তোমরা আমাকে না হয় পরাণদাদা বলেই ডেকো—বলতে বলতে ঘাটের ধারে নেমে গেল সে, ঘাটের পাশে পোঁতা একটা খুঁটি থেকে একটা লাঠির বাঁধন খুলতে লাগল।

—আমায় কেউ কিছু বলেই ডাকে না, আর ডাকবার আছেই বা কে! বলতে বলতে লাঠিটা তুলে ধরল পরাণ। বসন্ত দেখল ওটা একটা ছিপ, সুতোর ডগায় একটা শোলমাছ ছটফট করছে।

—রাতে ছিপ ফেলেছিলুম, বেশ বড়ো মাছ! আজকে কলমিশাক ভাজা, আর মাছের ঝাল! দারুণ জমবে। আজ আর ব্যবসায় বেরোব না, আজ অন্য কাজ আছে, মশলা তৈরি করতে হবে, গ্রাম থেকে মুড়ি আনতে হবে।

—অনেকদিন পর মাছ রান্না করলুম—খেতে বসে বলল পরাণ—আসলে একা একা খাওয়ার জন্য রান্না করতে ভালো লাগে না।

গাছ থেকে কলাপাতা কেটে আনা হয়েছে, তিন জনে একসঙ্গে খেতে বসেছে। ধপধপে সাদা ভাত আর বড়ো বড়ো মাছের দাগার ঝাল সবুজ কলাপাতার কোলে দেখাচ্ছে বড়ই মনোহর।

—এত বড়ো বড়ো মাছ আমরা কোনোদিন খাইনি, নারে দাদা!—বলতে বলতে ভরত জিভের জল সামলালো। বসন্ত তাকিয়ে দেখল ভায়ের আনন্দিত মুখ, আস্তে ঘাড় কাত করল।

—সবই মায়ের দান—বলল পরাণ—বুঝতে পারলে না তো? আমার মায়ের কথাও বলতে পারো আবার জগজ্জননীর কথাও বলতে পারো! আমার মা এসব করে দিয়ে গেছে—এই ঝিলের ধারে ঘর, এইসব গাছপালা—তাই তো আমি থাকছি, খাচ্ছি, আর তোমরাও খেলে। মা সগ্গে গেছে তা হয়ে গেল কত বছর! একেবারে থুত্থুড়ি বুড়ি হয়ে গেছিল, তখন আর বেরোতে পারত না, এই দোরে চুপটি করে বসে থাকত। আমি সকালে ভাত রেঁধে মাকে খাইয়ে তবে বেরোতুম।

—তোমার মাও বুঝি ভিক্ষে করত?—জিজ্ঞাসা করল ভরত।

—ভিক্ষে কিরে ব্যাটা? ব্যবসা বল! আমরা মায়ে ব্যাটায় অনেককাল ওই ব্যবসা করেছি।

—আর তোমার বাবা? ভাই বোন? এসব—

ভাত হাতে উদাস হয়ে গেল পরাণ—না রে, ওসব কিচ্ছু নেই, ছোটোবেলা থেকে শুধু মা আর আমি! মা-ই আমার সব, আমার জগজ্জননী!

—তাহলে ভিক্ষের ব্যবসা থেকে ঝালমুড়ির ব্যবসা ধরলে কবে থেকে?

—একদিন এক ফলওয়ালা মাকে যাচ্ছেতাই করে বলল—তখন মা আর ভালো ঘুরতে পারে না—বললে—বুড়ি, নিজে তো সারাজীবন ভিক্ষে করলে, ছেলেটাকেও ভিকিরি করলে! কিচ্ছু না হলে ওকে তো ঝালমুড়ি বেচতে দিতে পারো, ঘুরে ঘুরে হাঁফিয়ে না মরে ঘরে বসে এসব তৈরি করে বিক্রি করতে দিলে ছেলেটা তো সম্মানের সঙ্গে বাঁচে!

শুনে সত্যিই আমাদের চোখ খুলল। তারপর থেকে মা আর বেরোত না, ঘরে বসে আলুসেদ্ধ, ভিজে ছোলা, বাদামভাজা, নারকোল কুচি, গুঁড়ো মশলা—এসব তৈরি করে দিতো। মায়ের থেকেই তো এমন মুখরোচক গুঁড়ো মশলাটা তৈরি করতে শিখেছি। ঘরে ভাজা মুড়িটা নিয়ে আসি ওই গ্রামের এক বাড়ি থেকে। ঝালমুড়ির আমার খুব সুনাম।

হে হে করে হাসল পরাণ—কথা বলতে পাই না তো, তাই যত মনের কথা গুড় গুড় করে বলে ফেলছি। একা একা এক একদিন এত কষ্ট হয়! সারারাত ঘুমোতে পারি না, শেষে ভোরবেলা উঠে ইস্টিশানের বেঞ্চিতে গিয়ে শুয়ে থাকি। ভাতের গ্রাস মুখে তুলল পরাণ।

—মা মাঝে মাঝেই বলত একবার আমরা তারপীঠ যাব পরাণ, বড়ো সাধ। আমাদের আর কী, ভিক্ষে করতে করতে রেলগাড়িতে চলে যাব। তা একবার আমরা ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সে বড়ো আনন্দ হয়েছিল! তারাপীঠের রেলগাড়িতে কি গানের বাহার! তাদের বলে বাউল, একতারা বাজিয়ে গান শুনিয়ে সাহায্য চায়। তাদের ওই ব্যবসা।

পরাণ মাছটা রেঁধেছে বড়ো ভালো। খাওয়ার শেষে তারিয়ে তারিয়ে কাঁটা চুষে খাচ্ছিল ভরত, তাই দেখে পরাণ বলল—রান্না কেমন হয়েছে বল!

—ফাস্ কেলাস—বলল ভরত।

—রান্নাও শিখেছি আমি মায়ের কাছে! হুঁ হুঁ!—বড়ো এক গ্রাস ভাত মুখে পুরল পরাণ, মাছ ভেঙে মুখে পুরল, একটু চিবিয়ে গাল ভর্তি খাবার ধাতস্থ করে বলল—তারা মাকে দর্শন করে মায়ের আমার কী আনন্দ! তখন কি একটা উৎসব চলছিল, শ্মশান জুড়ে কত লোকজন সাধু সন্ন্যাসী, কত গানের আসর—সারা রাত শ্মশানেই কেটে গেল।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ খাওয়া চালিয়ে গেল পরাণ। তারপর হঠাৎ বলল—তারাপীঠ থেকে ঘুরে এসে মা মাঝে মাঝেই বলত—ইষ্টিশানের রাস্তার কাছে ওই বটগাছটার তলায় একটা চালা করে দোকান বসালে বেশ হয়!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল পরাণ, বলল—কিন্তু সে কী আর সহজ ব্যাপার!

পরাণদার মায়ের কথা শুনতে শুনতে দুই ভায়ের মনেও মায়ের জন্য আকুলতা, রাত্রে ঘুম আর সকাল থেকে রান্না খাওয়ার মধ্যে ওদিকের ভাবনাটা ঝাপসা হয়েছিল এখন সেটা প্রবল হয়ে দুজনকে আতুর করে তুলল।

দুপুরে কোথা থেকে কিছু খড় নিয়ে এলো পরাণ। কিছু শুকনো ঘাস আর খড় মাচার ওপর বিছিয়ে তার ওপর চট বিছিয়ে দিল। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল বসন্তর যখন সে মাচার নিচ থেকে টেনে বার করল একটা তোরঙ্গ। তোরঙ্গ খুলে বার করল দু তিনটে কম্বল। অবাক হয়ে গেল দুভাই।

—কী হলো? চক্ষু ছানাবড়া? আরে দূগ্গাপুজো, কালীপুজো, বড়োলোকের শ্রাদ্ধশান্তি এসবে অনেক জায়গায় দান-ধ্যান করে কম্বল কাপড় চাদর এসব, খোঁজ রাখতো মা আমার।

চটের ওপর একটা কম্বল বিছিয়ে দিল পরাণ, আরেকটা রাখল গায়ে দেওয়ার জন্য নিজে, দুভাইকে দিল একটা। তারপরও তোরঙ্গের মধ্যে আরও কিছু।

—ধুতি পরতে হবে তোমাদের, এক জামাপ্যান্টে তো চলবে না। নাও ধর—একটা খাটো ধুতি এগিয়ে দিল পরাণ, একটা গায়ের চাদরও দিল ভরতকে।

—সবই আমার মায়ের বুদ্ধি আর খাটুনির ফল, কত কিছু যে করে গেছে আমার জন্যে! আমিই শুধু মায়ের শেষ ইচ্ছাটা পুরণ করতে পারলুম মা।

—করলেই পারো—বলল বসন্ত।

—বলছিস পারব?

—আমি কী বলব! মনে হচ্ছে তুমি সব করতে পারো।

ছয়

সকালে আর বিকালে গরম ভাত। কোনোদিন আলুভাতে কাঁচালঙ্কা, কোনোদিন শাকভাজা, কোনোদিন কাঁচা শসা আর পেঁয়াজকুচি। কোনোদিন সব্জিও আনে পরাণ, সেদিন তরকারি রান্না হয়। সস্তার বেগুন পোড়া তো আছেই, দুই ভায়ের প্রিয় খাদ্য। একদিন ফুলকপিও এসে গেল—সেদিন একটা মাগুরমাছ আটকেছিল ছিপে, মাগুরমাছ আলু ফুলকপি দিয়ে—একেবারে রাজকীয় তরকারি! সেদিন খেতে রাত হয়ে গেল। সন্ধ্যের আগেই খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়তে হয়। কেরসিনের অনেক দাম, লম্ফ জ্বেলে রাত করে বাবুগিরি করলে চলে না! তবু একটু কেরসিন কিনে একটা লম্ফ তৈরি করে রেখেছে পরাণ। একটা ঢাকনাওলা শিশির ঢাকনা ফুটো করে তাতে ন্যাকড়া পরিয়ে সলতে করে দিব্যি লম্ফ তৈরি করেছে, খুব প্রয়োজনে সেটা জ্বালা হয়। তা ছাড়া সকালে

খেলে বড়োজোর বিকাল পর্যন্ত টানতে পারা যায়—তারপর পেটে পিঠে এক হয়ে যেতে চায়।

ভরত বলে—রোজ মাছ ধরলে বেশ হয়!

—না রে, মায়ের দান বুঝে সুঝে রয়ে সয়ে খেতে হয়, নাহলে চিরকাল চলে না। রোজ মাছ ধরলে ভাণ্ডার ফুরিয়ে যাবে।

অবশ্য এক একদিন একটা ডিম আনে পরান সেটা ভেজে ঝাল করে তিনভাগ করে ভালোই খাওয়া হয়। আরেক দিন গেঁড়ির ঝাল—খেয়ে ভরত বলে দারুণ টেস্ট!

—এটা কিন্তু মাঝে মাঝেই খাওয়া যাবে, অঢেল গেঁড়ি—একটা ডালপালা শুধু জলের ধারে ফেলে রাখ, একদিন পরে তুললে দেখবে একগাদা আটকে আছে! আলু পেঁয়াজ দিয়ে—আহ্!

আরেকটা জিনিস রাঁধে পরান — কচুর শাক, ঝিলের ধারে অঢেল হয়ে আছে কালো কালো কচু গাছ, কয়েকটা তুলে এনে ছাল ছাড়িয়ে ছোট ছোট করে কেটে সেদ্ধ করে জল ফেলে সামান্য তেলে দুটু কাঁচালঙ্কা চিরে আর এক চিমটি কালোজিরে দিয়ে নাড়া, ব্যাস! এত ভাল খেতে! ওটা দিয়েই ভাত খাওয়া হয়ে যায়!

রান্নাগুলি দেখে দেখে শিখে নিচ্ছে বসন্ত।

বসন্ত ভাবে—রোজ গরম ভাত জোগান তো দিচ্ছে পরাণদা! খাটুনির পয়সায়—ভাবতে ভালো লাগে না বলে ভাবতে চায় না সে। জঙ্গলের জীবনে সে দেখেছে, জঙ্গলের অনেক ভেতরে প্রত্যন্ত গ্রামে কত মানুষ মাসে একবার ভাত খেতে পায় না—তাও নুন ভাত! রাত থাকতে উঠে কাঠ মাথায় নিয়ে হেঁটে হেঁটে দূরবর্তী বাজারে পৌঁছতে বেলা হয়ে যায়, সেখানে সেগুলি বিক্রি করে সামান্য পয়সা নিয়ে ফিরতে ফিরতে সেই বিকেল—এভাবেই কাটে জীবন। কেন? এসব কথা ভাবতে গেলে মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে ওঠে অন্ধকার। ওই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার পথ কি?

কেটে যায় দিনের পর দিন। অবশ্য কাজও আছে। ঝিলের জল নেমে গেছে অনেকটা। তীরে তীরে বেড়ে ওঠা দীর্ঘ জলঘাসগুলিতে খয়েরী রঙ, ঘাসের শিষগুলি শুকিয়ে শক্ত কাঠি, সেগুলি কেটে কেটে আঁটি বেঁধে রাখা, হোগলা পাতা কেটে কেটে রোদ্দুরে পেতে রাখা। এগুলি লাগবে কুঁড়ে ঘরের চালে। অনেকদিন চালে চাপান দেওয়া হয়নি। আসলে পরান একক একঘেয়ে জীবনে কেমন নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল, এখন হঠাৎ আসা সঙ্গীদের সঙ্গে যেন নতুন জীবন পেয়ে গেছে। সঙ্গীদের কাজ বুঝিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে তার ব্যবসায়।

পরাণের সংগ্রহে ছুরি কাটারি কাস্তে কোদাল সব আছে। শুকনো ডালপালাও কেটে কেটে জড়ো করা হচ্ছে ঘরের পিছন দিকে চালার নিচে। এগুলি বর্ষাকালের জন্য জমা করা। দুই ভাই মহা উৎসাহে কাজ করে। দিন কেটে যায়।

খাবার ও রান্নার জন্য জল ইস্টিশানের টিউবওয়েল থেকে আনতে হয়। সেই ভোরবেলা যখন হালকা অন্ধকার তখন অনেকগুলো বোতল ভর্তি করে নিয়ে আসে সে। একাজটা পরাণের থেকে যেচে নিয়েছে সে। বুড়ো মানুষটা জলও বয়ে এনে খাওয়াবে!

যদিও পরাণ বিকালে ফেরার সময় দুবোতল জল ভর্তি করে আনে!

আরও কাজ আছে—ঝোপঝাড়ের মধ্যে খুঁজে দেখা—কোথায় একটা লাউ বা কুমড়ো গাছ, কোথায় উচ্ছে গাছ, কোথাও ধুঁধুল গাছ—এসব হয়ে আছে, বাড়তে পারছে না, সেগুলির চারপাশ পরিষ্কার করে গোড়ায় মাটি দিয়ে জল দিয়ে শুকনো ডালপালা ধরিয়ে দেওয়া। কটা লঙ্কা গাছ এনে দিয়েছে পরানদা, সেগুলি একসারি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা ডুমুর গাছ পাওয়া গেছে, ডুমুরে ভর্তি, দুজনে তুলে আনল কিছুটা, সেগুলি কেটে সিদ্ধ করে একটু চিনি দিয়ে ভাজলে পরানদা, কি দারুণ খেতে! একটা পেঁপে গাছও বেশ বেড়ে উঠেছে, সবে ফল ধরেছে।

আস্তে আস্তে সব্জি বাগান বেড়ে উঠছে। কলমি শাক আর শুসনি শাকতো আছেই। পরাণ বলে এসব আগে মা করতো, মা চলে যেতে আর ভালো লাগত না। এখন তোমরা করো। খুব ভালো লাগছে, আমি এটা ওটা সব্জি বীজ এনে দেবখন, একটু জায়গায় ধনে গাছ করো—

শীত চলে গেল। উত্তাপ বাড়ছে দিন দিন। শীতে কখন উঠোনের কুলগাছটায় ফুল ধরেছিল তারপর ছোটো ছোটো ফলে রূপান্তরিত— খেয়াল করা হয়নি, এখন রঙ ধরেছে বেশ। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে গাছটা। দু চারটে পেড়ে নুন দিয়ে খেয়ে কি মজা দুভাইয়ের! একদিন চাটনিও করা হলো, ভাতের সঙ্গে দারুণ জমে গেল।

সাত

একদিন পরাণ বলল—ঝিলের ধার থেকে নরম মাটি তুলে বড়ো বড়ো তালের মতো পাকিয়ে ঘরের সামনে এনে রাখতে।

—কতগুলো? জিজ্ঞাসা করল বসন্ত।

—কর না, তা পঁচিশ, তিরিশ, চল্লিশ—

—বাবা! এতো? কি হবে?

—লাগবে লাগবে, তবে একদিনে পারবে না।

প্রথম দিনই কিন্তু তিরিশটা বানিয়ে ফেলল ওরা, মাটি কেটে তাল পাকিয়ে ভরতের হাতে দেয় বসন্ত, ভরত নিয়ে রেখে আসে। বিকালে পরাণ এসে খুব খুশি! বাঃ! বাঃ! খুব খাটুনে ছেলেতো তোমরা! আজ তিনটে ডিম এনেছি, ডিম সেদ্ধ করে আলু পেঁয়াজ দিয়ে ঝোল আর ভাত! একটু বেশি চাল নিতে হবে মনে হচ্ছে, সারাদিন খুব খাটুনি খেটেছ।

বসন্ত এখন ভাতটা রাঁধে। মানে ভাত বসিয়ে উনুনে জ্বাল দেওয়া। জঙ্গলের জীবনে এসব সে করেছেও। উনুনে জ্বাল দিতে দিতে সে বলে—এতো খরচ হচ্ছে তোমার, আমরা দু দুজন তোমার ঘাড়ে বসে খাচ্ছি, তার ওপর আবার তিনটে ডিম আনলে —তা মনে কর আমার জন্য কাজ করছ তার বদলে খাচ্ছ, পরাণ বলল—তাহলেই আর ঘাড়ে বসে খাচ্ছ মনে হবে না। অমি তো তোমাদের বিনা মজুরিতে খাটাতে পারি না!

—এসব তোমার ভোলানো কথা—হেসে বলে বসন্ত। এই সামান্য রোজগারে তুমি কী করে চালাবে, আর কতদিনই বা চালাবে।

—যদ্দিন চলে চলুক— বলল পরাণ—আজকে একশ টাকা রোজগার হয়ে গেল তাই তিনটে ডিম কিনলুম—এই যাঃ! বলে ফেললুম—

—একশ টাকা রোজগার? অবাক হয়ে যায় বসন্ত। খরচ খরচা বাদ দিয়ে?

হ্যাঁ, আজ সব বিক্রি হয়ে গেছে। তবে পঞ্চাশ-ষাট টাকা রোজই হয়। ভিক্ষে করেও কিন্তু আমার এই রোজগারই ছিল।

—একশ টাকা? ভিক্ষে করে? ধ্যাৎ!

—দেখ্ ভাই, তাই বলে ভাবিস না যেন আমার ঘরে অনেক টাকা জমা আছে। একদিন মেরে ফেলে সেগুলো নিয়ে পালাবি।

—এই কথা তুমি বললে? দুঃখে মুখটা মলিন হয়ে যায় বসন্তর।

—কি বলতে কি বলে ফেললুম—আফশোস করে পরান—সত্যি কথাটা বলেই ফেলি, মা আমার খুব গুছোনি ছিল। দুটো ইষ্টিশান আগে পলাশপুর ইষ্টিশানে শেডের এক কোণে তখন আমরা থাকতুম সেখানে এক মাষ্টার মশাই আমাদের পোষ্টআপিসে বই করে দিয়েছিল। তখন আমি ছোটো ছেলে, তখন লোকে এক পয়সা দু পয়সা ভিক্ষে দিত। মা আমার তা থেকেই জমা করে করে একটাকা দু টাকার নোট গাঁথত, এরকম করে কিছু টাকা জমিয়ে ছিল মা, পুঁটুলিতে সেই টাকা নিয়ে ঘুরত, ভয় লাগত যদি কেউ কেড়ে নেয়। তা ইষ্টিশনের কাছে এক মাস্টারমশাই থাকতেন, খুব ভালো মানুষ। আমাকে একটু লেখাপড়াও শিখিয়েছিলেন, তা মা মাষ্টারমশাইয়ের কাছে টাকাগুলো গচ্ছিত রাখতে চাইলে মাষ্টার মশাই পোষ্টআপিসে বই করে দিলেন, সেখানে এখনও আমি টাকা পয়সা জমা করে আসি। নে, ভাত হয়ে গেছে, নামিয়ে ডিম সেদ্ধ বসিয়ে দে।

হতভম্ব বসন্ত কথা বলতে ভুলে গেল।

—যে কাজই কর মন দিয়ে করতে হবে, বুঝলে কিনা, পরাণ আবার বকবক শুরু করল। এই রেল লাইনের দুপাশে কত গ্রাম, যেসব গ্রাম বড়ো আর পয়সাওলা লোকের বাস বেশি সেসব গ্রামে মাঝে মাঝে মায়ে বেটায় চলে যেতুম, ঘন ঘন গেলে হবে না কিন্তু। সব হিসেব করা—দু হপ্তা তিন হপ্তা অন্তর—এক মাস না গেলে দয়ালু মানুষ কেউ কেউ বলত— কী পরাণের মা, এতদিন আসোনি কেন? ঘন ঘন গেলে হবে না, বুঝলি না! গ্রামে গেলে চাল আলু এটা ওটা পাওয়া যেত, যার দাম একটাকা দু টাকা দানের চেয়ে বেশি। এ ছাড়া রেলগাড়ি তো আছেই!

—বাপরে বাপ, এর মধ্যেও এত!—বলে বসন্ত।

—সবই আমার মায়ের শিক্ষা, বুঝলে কিনা!

একটু বেশি আলু দিয়ে ঝোলটা একটু বেশি করে করে নাও—বলে বসন্ত—সকালের জন্য খানিকটা রেখে দিলেই হবে, সকালে শুধু ভাত রেঁধে আলু ঝোলটা গরম করে নোবো।

দুদিন ধরে গোটা পঞ্চাশ তাল মাটি জড়ো হলো। পরাণ বলল—আর নয়।

সেদিন শেষ রাতে বসন্তকে ডাকল পরাণ, শুরু হলো মাটির তাল বয়ে নিয়ে যাওয়া। আকাশ ভরা জ্যোৎস্না। তার মধ্যে দুটি প্রাণীর যাওয়া আসা—ঝুড়ি করে মাটির তালগুলি এনে ফেলল বটতলায়। ব্যাপারটা এতক্ষণে দুই ভাই বুঝতে পারল। ভরতও একটা করে মাটির তাল নিয়ে যেতে লাগল। এ জায়গাটা একটু উঁচু করে বাঁশ খুঁটি দিয়ে চালা ঘর করেই দোকান করার মতলব পরাণদার!

—লোকজনের চোখের সামনে না করাই ভালো, বুঝলি না,—বলল পরাণ—, নানান জন নানান কথা জিগ্যেস করবে, শেষে হয়ত বারণই করবে! যদিও এসব রেলের জমি!

এরপর একদিন কাজে বেরোলো না পরাণ, সেদিন দুভাইকে সঙ্গে ডেকে নিয়ে চলল ঝিলের ধার দিয়ে।

পরাণ যথারীতি বকবক করতে থাকে— মা আমার সব বন্দোবস্ত করে গেছে রে, সেই ভোর থেকে উঠে রোজ এখানে ঘুরে ঘুরে টুকটুক করে কত কাজ যে করত! ঝিলের ধারে এমনিতেই কত গাছ জন্মায় আবার মরেও যায়। তার মধ্যে দরকারি গাছগুলির চারপাশ পরিষ্কার করে দিলে সেগুলি দিব্যি বেড়ে ওঠে। পেঁপে গাছ তো কতই হতো! কোথাও একটা হয়ত উচ্ছে গাছ হয়ে আছে। সেটার চারপাশ পরিষ্কার করে একটা ডালপালা ধরিয়ে দিলে কেমন বেড়ে ওঠে। দুটো লাউকুমড়োর দানা পুঁতে দাও, কি একটা পুঁইশাকের গোড়া—চারা গজিয়ে আপনিই বেড়ে উঠবে। প্রথম প্রথম শুধু একটু জল দাও, একটু বাড়লে একটা ডালপালা ধরিয়ে দাও—ব্যস! এসব মা করত, মায়ের সঙ্গে আমিও হাত লাগাতুম। এখন যা হোক তোমরা করছ।

একটু চুপচাপ হাঁটল পরাণ—সামনে একটা শিউলী গাছ ঝোপঝাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে পড়ল পরাণ, গাছটাকে দেখতেই থাকল। হঠাৎ গাছটার গায়ে হাত দিয়ে সামান্য ঝাঁকুনি দিল, ঝরে পড়ল অজস্র ফুল। সুগন্ধে ভরে আছে বাতাস।

—গাছটা কত বড়ো হয়ে গেছে—ফিসফিশ করে বলল পরাণ—এখানে আমার মা শুয়ে আছে—বসন্ত আর ভরতের দিকে তাকাল পরাণ।

—এখানে শুয়ে আছে—মানে—অবাক বসন্ত জিজ্ঞাসা করল।

—এখানেই মাকে আমার সমাধি দিয়েছি।—গাঢ় গলায় বলল পরাণ—সে একদিন গেছে, বিকেলবেলা ফিরে দেখলাম মা আমার দুয়ারে বসে—কেমন যেন—ঘাড়টা ঝুলে পড়েছে—গায়ে হাত দিতে ধুস করে পড়ে গেল, কী ঠাণ্ডা গা! আর শক্ত কাঠ। মা আমার শেষ বয়সে রোগা ছোট্টটি হয়ে গিয়েছিল। বলত— পরাণ আমি মরে গেলে কাকে ডাকবি, কী করেই বা পোড়ানোর ব্যবস্থা করবি, তার চেয়ে এখানেই কোথাও মাটির নিচে সমাধি দিয়ে দিস। সমাধি কথাটা আমরা শিখেছিলুম তারাপীঠের শ্মশানে, শ্মশানের মধ্যে মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা মাটির ঢাল। সাধু সন্ন্যাসিরা সাবধান করে দিচ্ছে— ওগুলো মাড়িও না, ওটা সমাধি ওখানে মরদেহ সমাধি দেওয়া আছে। তা মায়ের ওটা

খুব মনে ছিল—বলতে বলতে গলা ধরে এল পরাণের। উবু হয়ে বসে দু চারটে ফুল কুড়িয়ে নিল।

—এই শিউলি গাছটা এতটুকু বসিয়েছিলুম, আজ আমরা এখনটা পরিষ্কার করব, ন্যাতা দিয়ে ধূপ দেবো, আজ আমার মায়ের মৃত্যুদিন, আজ পয়লা চৈত্র। এ সংসারে মা আর আমি হিসাবের বাইরের মানুষ, রেশন কার্ড নেই, ভোটার কার্ড নেই—গুনতির বাইরে।

ঝোপঝাড় পরিষ্কার করতে করতে সহসা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ভরত।

—কি হলো? জিজ্ঞাসা করতে বলল—মায়ের জন্য মন কেমন করছে।

মায়ের জন্য বসন্তর মনেও কষ্ট আছে, কিন্তু ভরতের মতো ঠিক অতখানি নয়। আসলে সে প্রায় দু বছর মাকে ছেড়ে জঙ্গলের জীবনে থাকতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। মাসে হয়ত একদিন এক ঘন্টার জন্য রাত্রে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসত। জঙ্গলের জীবনে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। নাওয়া খাওয়া শোয়া কোনো কিছুর ঠিক ঠিকানা নেই। কোনোদিন কারো চালায় তো কোনোদিন গাছতলায়। আজ এখানে, কাল সেখানে, শুধুই পালিয়ে বেড়ানো আর সারাক্ষণ একটা আতঙ্কের যন্ত্রণা বহে বেড়ানো। তার সঙ্গে তাড়িয়ে বেড়াত নিহতদের আর্তনাদ। সেইসব রক্তাক্ত মৃত্যু মস্তিষ্কে চেপে বসে ছুটিয়ে বেড়াত। শান্তি নেই স্বস্তি নেই। ক্রমশঃ বিভিষীকাময় হয়ে উঠছিল জীবন। এই কি মুক্তির পথ! সে নিজেকে কিছুতেই মানাতে পারত না।

এখন এই শান্তির জীবনে সামান্য খাওয়া, সামান্য শয্যা—এর মধ্যে এক সুখের জীবনে স্বস্তির জীবনে সে আনন্দের স্বাদ পেয়ে আপ্লুত। মায়ের অদর্শন তাকে অতটা উতলা করে না। শুধু মাঝে মাঝে মনে হয়—মা কেমন আছে? ভালো থাকুক, মা ভালো থাকুক— মনে মনে প্রার্থনা করে সে।

—আমাদের মা ভালো আছে ভরত, কাঁদিস না, নিশ্চয় ভালো আছে।

আট

লক্ষীমতি কিন্তু ভালো নেই। কেঁদে কেঁদে তার চোখদুটি অন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। মাথায় সামান্য চোট লেগেছিল, ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে। কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ না করে ওষুধপত্র দিয়ে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। বড়বাবু তাকে বারবার অনুরোধ করেছিল—দেখ, সকলকে সত্যি কথাটাই বলবে, তুমি পড়ে গিয়েছিলে, আমরা মারধর করিনি, দু একটা কথা জানবার জন্য ডেকে এনেছিল, যাকগে যাক, তোমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা করব না।

তা সে সকলকে সেই কথাই বলেছে।

কিন্তু এই ফাঁকা বাড়িটা তাকে সারাক্ষণ যেন গিলতে আসে। মনটা সব সময় হু হু করে। দুই ছেলের কথা—বিশেষতঃ ভরতের কথা মনে পড়ে। ছোটো ছেলেটাকেও নিয়ে গেল ওরা। হায়রে বনে জঙ্গলে বেচারী কিভাবে আছে। আহারে বাছা আমার! ভাবতে

ভাবতে তার চোখ জলে ভরে ওঠে। সে জল আর শুকোয় না।।

রাত্রে ভালো ঘুম হয় না তার। মাঝে মাঝে খুটখাট শব্দ হলেও সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে—ফিস ফিস করে বলে—বসন, এলি? কিন্তু না, কেউ সাড়া দেয় না। সকালে অনেকক্ষণ দুয়ারে বসে থাকে, তার কোনো কাজ নেই। কার জন্য কাজ করবে? কার জন্য রান্না করবে? নিজের জন্যে?

পাশের বাড়ির কানাইয়ের মা ঠুক ঠুক করে আসে, বলে—ও লক্ষী, অমন করে বসে থাকিসনি, মুখ ধো, চান কর, যা হোক একটু ভাত ফুটিয়ে খা, ঠাকুরের কাছে মানত কর—ছেলেরা যেন ভালো থাকে। এ কি কাণ্ড মা! দু দুটো ছেলেই জঙ্গলে চলে গেল গা। কোনো আক্কেল নেই তাদের! মা যে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যেতে বসেছে।

—না গো মা, ছেলেদের আমার ইচ্ছে নেই,—ফিস ফিস করে বলে লক্ষী,—ওদের জোর করে দলে আটকে রেখেছে।

—তা যাই হোক মা, যা হোক একটু ফুটিয়ে পেটে দে। পোড়া পেটে খাবার না দিলে বাঁচবি কি করে। দিন ফিরবে, ছেলেরা ঠিক ফিরে আসবে, তোর সোয়ামীটা আছে বিভূঁয়ে। কবে ফিরবে নিতাই?

—সে তো পাথর খাদানের কাজ মা, বর্ষা শুরু হলে ফিরবে। আর! সে কোন বাড়িতে ফিরবে মা? ফিরে কি দেখবে? আবারও কান্না শুরু হয়ে যায়। দেখতে দেখতে কানাইয়ের মায়ের চোখেও জল আসে।

আজ মঙ্গলবার। মঙ্গলবার এলেই তার মনটা দুলে ওঠে, হয়তবা—

আজ সে রান্না করেনি। গতকালের ভাত একটু জল দেওয়া ছিল—সেটুকু খেয়ে দুয়ারে শুয়ে। চৈত্রের তীব্র রোদ বাইরে, মাঝে মাঝে হাওয়া দিচ্ছে যেন আগুনের ঝলক। শুয়ে শুয়ে ভাবছিল এবেলা কি ভাত রাঁধবে? যদি আসে দুই ভাই—ভাবছিল আর কাঁদছিল এমন সময় উঠোনো কে যেন বলল—ওমা—মা—

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে—কে ডাকে? মা বলে কে ডাকে? দেখল বেড়ার বাইরে বুড়ো মতো একজন মানুষ, পরনে ছেঁড়া ফাটা গেরুয়া জামা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মানুষটি বলল—দুটো ভিক্ষে হবে মা? বলতে বলতে আগড় ঠেলে উঠোনে এসে দাঁড়াল, বলল—আহারে, মায়ের আমার এ কি অবস্থা! দু দুটো ছেলে মায়ের—বাড়ী ছাড়া, মা কি আর ভালো থাকতে পারে! তবে ভাবিসনি মা, তোর ছেলেরা ভালো আছে।

—কে বাবা তুমি? ছেলেরা আমার কোথায়?

এদিক ওদিক তাকিয়ে সাধু আরেকটু কাছে এগিয়ে এলো, চুপি চুপি বলল—শোন, আমি আসছি অনেকদূরের এক গাঁ থেকে, রেলগাড়িতে তিন ঘন্টার পথ, সেই গাঁয়ে তোর ছেলেরা আছে, এখান থেকে পালিয়ে সেখানে ভালোই আছে আমার আশ্রয়ে, কিচ্ছু চিন্তা করিস না, আমি আবার আসব—ফিরে দাঁড়াল সাধু—চলে যায়—

—বাবা, বাবা, আমি যাবো বাবা, আমাকে নিয়ে চলো—আলুথালু নেমে আসে লক্ষীমতি।

—চুপ চুপ, অস্থির হোসনা, ধৈর্য ধরে থাক,—বলল সাধু—মনকে শক্ত কর, কেউ যেন না জানে। আমি আবার আসব সময় মতো—দ্রুত বেরিয়ে যেতে যেতে বলল—তাদের বলব—তোমাদের মাকে বলে এসেছি ভালো থাকতে—

উঠোনেই বসে পড়ল লক্ষীমতি। কে এলো? ভগবান? সত্যি কথা বলে গেল? নিশ্চয় সত্যি বলে গেল, শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলতেই বা আসবে কেন? ভালো আছে, আমার ছেলেরা ভালো আছে। বাবা বসনরে ভরতরে আমি বেঁচে থাকবো বাবা, তোদের পথ চেয়ে বেঁচে থাকবো রে—কাঁদতে কাঁদতে মৃদুস্বরে বলল লক্ষী, বলেই চলল বারবার।

ফিরতে ফিরতে পরাণের সন্ধে পেরিয়ে রাত। দু ভাই রাঁধেও নি, খায়ওনি। রাত থাকতে উঠে কখন যে মানুষটা বেরিয়ে গেছে বলে যায়নি। কাল রাতে বাক্স খুলে খুটখাট করে কি যেন সব বার করছিল—ফিরল এই রাত করে! পরনে ছেঁড়া ফাটা গেরুয়া পোষাক— ঘেমে নেয়ে একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থা, কাঁধের তাপ্পি মারা ঝোলাটা নামিয়ে বলল—দে একটা জলের বোতল দে—ধপ্ করে বসে পড়ল।

—ব্যাপারটা কি তোমার? কাল বাক্স থেকে এইসব জামাকাপড় বার করছিলে বুঝি? রাত থাকতে ভিক্ষেয় বেরিয়েছিলে? আমাদের খাওয়াতে তোমার এই অবস্থা? আমি আর ভরত ঠিক করেছি কাল আমরা একঝোড়া কুল নিয়ে হাটে যাব বিক্রি করতে, ওই দেখ—দুয়ারে বসানো এক ঝুড়ি কুল দেখাল বসন্ত।

হা হা করে হাসল পরান, বলল ঠিকই ধরেছিস, ভিক্ষেয় বেরিয়েছিলুম, গিয়েছিলুম সেই কমলিয়া গাঁয়ে, গাঁয়ের শেষ বাড়িটা—যার সামনে একটা নিমগাছ আছে— তোদের মাকে বুঝিয়ে বলে এলুম সব।

—এ্যাঁ! এ্যাঁ! ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই ভাই—বলছ কি তুমি? ওই জন্যে বুঝি কাল ওইসব জিজ্ঞাসা করছিলে? —মা কেমন আছে পরাণদা?

—আগে ভাত চাপা, বেশি করে চাল নে, পেটে বিশেষ কিছু পড়েনি। ওই একরকম আছে!

—ও! আমরাও সারাদিন খাইনি।

—এ কি কথা? কেন? কেন খাসনি?

—বা রে, তুমি কিছু না বলে কিছু না খেয়ে চলে গেলে—

—খুব অন্যায় কথা, খুব অন্যায় কথা—মাথা দুলিয়ে বলল পরান, কিন্তু অন্যায়টা কার সেটা বোঝা গেল না।

—যাই হোক, আমরা ঠিক করেছি যা হোক কিছু রোজগারের চেষ্টা করব। বলল বসন্ত—এই তো দেখি পিঁপড়ে, কাঠবিড়ালী এরাও নিজেদের খাবার নিজেরা জোগাড় করছে।

—বাঃ বাঃ! খুব ভালো কথা বলেছিস, কিন্তু ওই কটা কুল হাটে নিয়ে গিয়ে ক পয়সা পাবি? তার চেয়ে কাল আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়, কিছু ঠোঙা নিয়ে নে আর

কিছুটা নুন, দশটা করে কুল ঠোঙায় একটু নুন ছড়িয়ে দিলে ট্রেনে খুব বিক্রি হয়ে যাবে এক টাকায়।

পরদিন ভাত খেয়ে মহা আনন্দে দুই ভাই বেরিয়ে পড়ল পরাণের পিছু পিছু।

ট্রেনে কতরকমের যে মজা! দু ভাই অবাক! কত কিছু বিক্রি হয়রে ভাই! ফল, বিস্কুট, মুড়ি, চানাচুর, বই খাতা, খেলনা—একজন কি একটা বিক্রি করছে—একদিকে ফচ্ করে আগুনের শিখা আবার অন্য দিকে টর্চের আলো। পাঁচ টাকা দাম। ভরতের খুব ইচ্ছা হচ্ছিল একটা নিতে।

যুবক বসন্ত কিন্তু অতিশয় মনোযোগী। 'কুল, কুল' বলে হাঁকতে যদিও সঙ্কোচ লাগছে তথাপি সে নিজেকে বোঝালো—সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে হবে। এটাই তো জীবনের লড়াই, লড়াই করে বাঁচতে হবে! পিঁপড়ে অতটুকু প্রাণী—নিজের খাবার সেও জোগাড় করে নেয়!

কত স্টেশনে গাড়ি থামছে, কত লোক উঠছে নামছে, এদের মধ্যে সামান্য দু চারজন তার জিনিস কিনলেই অঢেল! অর্ধ দিনেই কাজ শেষ, পঁচিশ টাকার বিক্রি হয়েছে। এক অপূর্ব তৃপ্তি অনুভব করল বসন্ত। তার ইচ্ছা হচ্ছিল ছুটে গিয়ে মাকে বলে—দেখ মা, আমি রোজগার করেছি পঁ-চি-শ টাকা! ভাইকে একটা চটি কিনে দিতে হবে মা, আজ সারাদিন খালি পায়ে ঘুরেছে।

নয়

একদিন অন্তর মুড়ি কিনে আনে পরান। দুটো বড়ো বড়ো প্লাস্টিকের প্যাকেটে মুড়ি নিয়ে আসে গ্রাম থেকে। আর আনে খবরের কাগজের ঠোঙা। ঠোঙা করে কুল বিক্রি করতে গিয়ে মাঝে মাঝে ঠোঙার গায়ে চোখ চলে যায়, দু চার লাইন পড়ে ফেলে অজান্তেই। এক একদিন সকালবেলা কয়েকটা ঠোঙা নিয়ে উল্টে পাল্টে পড়ে, ভাইকে

বলে—পড়তো, একটু রিডিং পড়াই না হয় অভ্যাস হোক। ভরত পড়ে— আটকে আটকে যায়—পড়, একটানা পড়তে চেষ্টা কর—বলে বসন্ত। তার মনে হয় ভায়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়াটা খুব খারাপ হচ্ছে। মন খারাপ হয়ে যায় তার। ট্রেনে ট্রেনে ঘুরতে ভরতের খুব মজা! এদিকে কুল গাছে কুল শেষ হয়েছে তো ওদিকে জামগাছে ফল যেন উপছে পড়ছে। গাছে উঠে জাম পাড়তেও ভরতের খুব মজা, প্লাস্টিক প্যাকেট নিয়ে দুই ভাই গাছে ওঠে, জাম পাড়ে। জাম আরও ভালো দামে বিক্রি হয়। দশটা জাম নুন মরিচ ছড়িয়ে দু টাকা। কিন্তু এভাবে ভরতের জীবন থেকে লেখাপড়ার যোগাযোগটা যদি সরে যায় পরে আর পড়াশোনা হবে না। কিছু একটা করা দরকার।

ব্যবস্থা কিছু করা গেল। ট্রেনে হকারের কাছ থেকে কয়েকটা খাতা কিনল সে, আর কলম। দু একটা বইও কেনা গেল—জ্ঞানের আলো, ইংরাজি শিক্ষা—এরকম ধরনের বই। রোজ সকালে এবং সময় হলে বিকালবেলা ভরতকে পড়াতে শুরু করল বসন্ত।

বাঃ! বাঃ! এতো ভালোই ব্যবস্থা হলো রে! পরাণ বলে—হাঃ! হাঃ! হাঃ! আমিও একটু হাতের লেখা করতে শুরু করব নাকি?

একদিন সকালবেলা গেঁড়ির ঝাল, পেঁয়াজ দিয়ে মুসুর ডাল এসব রাঁধতে রাঁধতে হঠাৎ পরানের মনে হলো মুড়ি ফুরিয়ে গেছে, আমাকে তো মুড়ি আনতে হবে।

—ও বসন—মুড়ি এনে দিবি? কাজের মধ্যে ভুলেই গেছি, এই গেঁড়ি বাছা কি কম ঝামেলা! দেরি হয়ে গেল।

—কোথা থেকে মুড়ি আনো? আমি তো গ্রামের দিকে যাইনি কখনো।

—ওই রাস্তা ধরে সোজা চলে যাবি, গ্রামে ঢুকে দেখবি রাস্তাটা দু ভাগ হয়ে গেছে, ডানদিক ধরে সোজা চলে যাবি, ডানদিকে একটা বড়ো পুকুরের পাশ দিয়ে রাস্তাটা ঘুরে গেছে, ঘুরে ওপারে চলে যাবি, জিজ্ঞাসা করবি রাধামাসীর বাড়ি— যে কেউ দেখিয়ে দেবে, মাসীকে আমার নাম বলবি, দুটো প্যাকেট নিয়ে চলে যা, বিছানার তলা থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যা।

—টাকা আমার কাছে আছে।—বলতে বলতে বসন্ত ঘরে যায় প্যাকেট নিতে।

—তা কেন? তোদের ব্যবসার টাকা আমার ব্যবসায় ঢুকবে কেন?

—ও, 'তোদের' 'আমার'—এসব তো বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছ? তাহলে খাওয়াটাও তো তোদের আমাদের—এসব করতে হয়।

—আহা, আমি কি তাই বললুম? তোদের টাকাটা জমছে জমুক না, একসঙ্গে বড়ো কাজে লাগবে।

—সে দেখা যাবে তখন—বলতে বলতে বেরিয়ে গেল বসন্ত।

—আমিও যাব দাদা—বলতে বলতে ভরত উঠতে চায়!

—এ্যাই, এ্যাই, তুই লাফাচ্ছিস কেন? যেমন লিখছিলি লেখ—পরান চোখ পাকায়,—এখন হতদরিদ্র গোমুখ্যুও বোঝে লেখাপড়াটা করা দরকার। বুঝলি।

—হ্যাঁ!—ভরত ঘাড় গুঁজে লিখতে শুরু করল।

রাধা মাসীর বাড়ি খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধা হলো না। নোনা ধরা ইটের পাঁচিল সদর দরজা খোলা, উঠোন দেখা যাচ্ছে, বসন্ত ইতস্তত করছিল ঢুকবে, না ডাকবে?

—যাও, ভেতরে চলে যাও, মুড়ি নেবে তো?—যে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিল রাধা মাসীর বাড়ি কোনটা—সে বলল। ভেতরে ঢুকে পড়ল বসন্ত।

উঠোন পেরিয়ে ঘর দুয়ার, ইটের দেওয়াল, টালির চালের বাড়ি, দোরে একদিকে মুড়ি ভাজছে মাসী, বাঁহাতে করে এক মুঠো চাল উনুনে চাপানো পাত্রে দিচ্ছে, ডান হাতে ছোটো ঝাঁটা একটা। তার উল্টো দিক দিয়ে দ্রুত হাতে নাড়ছে আর তুলে তুলে মুড়ি ফেলে দিচ্ছে বাইরে। মুড়ি ভাজবার পাত্রটা অদ্ভুত! চ্যাপ্টা মতো একটা বড়ো হাঁড়ি, তার একদিকটা আবার কাটা, সেই কাটা অংশ দিয়েই মুড়িগুলি বাইরে ফেলছে, জমে উঠছে মুড়ির স্তূপ। কৌতূহলী চোখে দেখতে লাগল বসন্ত।

—কি চাই? মুড়ি?—বাঁদিক থেকে কে যেন প্রশ্ন করল। ঘাড় ঘুরিয়ে বসন্ত দেখল বাঁদিকে একটা ঘরের দুয়ারে বসে একটি মেয়ে, তার সামনে স্তূপীকৃত কাগজের গোল্লা মতো কিছু, সম্ভবত ঠোঙা তৈরির প্রথম পর্যায়।

—হ্যাঁ, পরানদা পাঠিয়েছে—হাতের বড় প্যাকেটদুটো একটু তুলে বলল বসন্ত।

—কে? পরান?—এক পলক তাকিয়ে বলল রাধা মাসী, পরানের আবার ভাই কোত্থেকে এলো? তিনকুলে তার কেউ আছে বলে তো কোনোদিন শুনিনি। কাজের হাত কিন্তু সমানে চলছে।

—আমি, আমি, মাসতুতো ভাই—বুদ্ধি এসে গেল বসন্তর মাথায়।

—অ! প্যাকেট দুটো তো পরানেরই দেখছি! দে রে মিনু, মুড়িটা মেপে দে—কাজের হাত কিন্তু সমানে চলছে মাসীর।

—এখানে বসুন—মিনু বলল, যে আসনটায় বসে সে কাজ করছিল সেটা এগিয়ে দিয়ে বসন্তর হাত থেকে প্যাকেট দুটি নিয়ে উঠে গেল ও দুয়ারে, আসনটায় বসার আগে আসনের কারুকার্যে চোখ গেল বসন্তর, সুতোয় বোনা আসনে ভারি সুন্দর একটা পদ্মফুল, দুপাশে দুটো পাখি, এক কোণে লেখা 'মিনু'। বসল আসনে। সামনে ভাঁজ করা কিছু

ঠোঙা—এটা ঠোঙার দ্বিতীয় পর্যায় সম্ভবতঃ। একটা তুলে নিয়ে দেখল সে, ভাঁজ খুলে আবার ভাঁজ করে রাখল, রাখতে গিয়ে সহসা চোখে পড়ল পাশে একটা খোলা বই। অবাক হয়ে তুলে নিল বইটি—স্কুলের বই—সামনের পাতায় চোখ বোলাল—অষ্টম শ্রেণির ভূগোল বই, নাম লেখা মিনতি নন্দী, তাড়াতাড়ি বইটা নামিয়ে রাখল, ওপাশে তাকিয়ে দেখল বেতে বোনা একটা বড়ো পাত্র দিয়ে মেপে মেপে মুড়ি প্যাকেটে ভরছে মিনতি নন্দী।

আশ্চর্য্য! মেয়েটি তাহলে কাজ করতে করতে পড়াও করছিল! ভাবল বসন্ত—হঠাৎ দিলীপ স্যারের কথা মনে পড়ল তার, স্যার বলতেন—লেখাপড়াটা মন দিয়ে করো, যত অভাবই হোক, যত অসুবিধাই হোক পড়াশোনা করো, বলতেন—শিক্ষা আনে চেতনা, লেখাপড়া শিখলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে এগিয়ে চলতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে, এখন তোমরা ছোটো, সব কথা ঠিক বুঝবে না। তবু মনে রাখো। ওই কথাটা তার খুব ভালো লেগেছিল—শিক্ষা আনে চেতনা ... বারবার বলতেন দিলীপ স্যার, বারবার শুনতে শুনতে কথাগুলি তার মনে দাগ রেখে গিয়েছে।

সহসা তার বুকের মধ্যে ঠেলে উঠতে চাইল কান্না—আমি আপনাকে মারতে যাইনি স্যার, আমি আপনাকে মারতে যাইনি—মনে মনে বলল সে, দুহাতে মুখ ঢাকল। ... কিন্তু আমি তো স্যারের সামনে দুহাত মেলে দাঁড়িয়ে স্যারকে আড়াল করে বলতে পারিনি—না, স্যারকে মেরো না, তার আগে আমাকে মারো ... না, তা পারা যায় না—ভাবল সে, নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করল—এরা কি ভাববে!

মুড়ি ভরা হয়ে গেছে, প্যাকেট দুটোর মুখ বাঁধছে মিনু।

রাধা মাসীর সাদা কাপড় দেখে বোঝা যায় উনি বিধবা। ওদের অধ্যবসায় দেখে অবাক হয়ে গেল বসন্ত।

—রাধামাসী কিছু বলছিল নাকি?—জিজ্ঞাসা করল পরাণ।

বলছিল—ভাই আবার কোত্থেকে এলো, তিনকুলে তো কেউ নেই জানতুম।

—তুই কি বললি?

—বললাম—মাসতুতো ভাই।

—গ্রামে যাওয়া বোধহয় তোর ঠিক হবে না। কি বলতে কি বলে ফেলবি, জানাজানি হয়ে গেলে পুলিশে যদি খবর চলে যায়? কি যে সব করে এসেছিস আমিও তো ভালো জানি না।

—না না, তোমার এ কাজটা আমিই করে দেবো, মুড়ি নোবো চলে আসব, এ কথা সে কথার দরকারটা কি। সকালে রান্না করতে করতে তোমাকে ছুটতে হয়।

—ঠিক আছে, তবে খুব সাবধান। তোদের গ্রামে যেতে আমার যা ভয় লাগছিল! পুলিশ যদি থাকে ধরে জিজ্ঞাসা না করে, আবার ওদের লোক যদি নজর রাখে—তাহলে অচেনা মানুষ—আবার সাধুর সাজ—পুলিশের চর ভেবে হয়ত—

—ওসব গাঁয়ে কেউ ভিক্ষা করতে যায় না পরাণদা, পোষায় না, তুমি খুব ঝুঁকি

নিয়েছিলে, আমাদের জন্য তুমি আর এমন করে বিপদের মুখে যেও না—বলতে বলতে বসন্তর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো,—তুমি যাবে জানলে আমি তোমাকে বাড়ির নিশানা সব বলতাম না।

দশ

দিনগুলি কাটছে প্রচণ্ড ব্যস্ততায়, সব্জি বাগান দেখাশোনা, জাম পাড়া, কিছুটা রান্না করা, তারপর ব্যবসায় বেরোনো, এক একদিন বিজয়গঞ্জে পরানদার ব্যবসার জিনিসপত্রও কিনতে যেতে হয়—বাদাম, ছোলা, চানাচুর, নারকোল । লেখাপড়া আছে তারই মধ্যে। বটতলায় মাটি ফেলা হয়েছিল। আরও কিছু মাটি তুলে জড়ো করা হলো একদিন, সেদিন কেউই ব্যবসায় বেরোল না। মাঝে মাঝে অবশ্য এরকম এক একদিন বেরোনো হয় না। পরানদা বলে—এক একদিন ছুটি নেওয়া ভালো, শরীর মন ঠিক থাকে। একটু শুয়ে বসে থাকো, একটু গাছপালার সঙ্গে কাটাও, না হয় ছিপ ফেলে বসো।

এর মধ্যে মুড়ি আনতে যাওয়াটা বসন্তর মনে কেমন একটা চঞ্চলতার ছোঁয়া দিয়ে যায়। জড়ো করা মাটিগুলি এক পূর্ণিমা রাতে বটতলায় নিয়ে গিয়ে ফেলা হলো। বেশ খানিকটা উঁচু হয়েছে জায়গাটা। কেটে রাখা দীর্ঘ জলঘাস আর হোগলা পাতা শুকিয়ে গেছে। একদিন সেগুলি চাপানো হল কুঁড়ের চালে। পরান চালে উঠল, নিচে থেকে দুই ভাই আঁটি বেঁধে বেঁধে তুলে দিতে লাগল। নারকোল দড়ির টানা দিয়ে দিয়ে ভালো করে বাঁধন দিলো পরান। এর মধ্যে দু চারবার ছোটো খাটো কালবৈশাখী হয়ে গেছে। ঝড় বৃষ্টির দাপট ঝিলের বুকে তুফান তোলে। যদিও কুঁড়ের পিছনে রেললাইনের উঁচু বাঁধ থাকায় ঘরটার ওপর বিশেষ আঘাত হানতে পারে না ঝড়।

মাচার ওপর লাউগাছ যেন উথলে পড়ছে। সতেজ ডগাগুলি বিস্তারিত হওয়ার জন্য আরও জায়গা চায়। লাউও ধরেছে দু চারটে, মাচার নিচে নীচু হয়ে লাউগুলি ঠিকঠাক ঝুলিয়ে দেয় পরান, কলা গাছের ঝাড়ে মোচা পড়েছে, শুকনো পাতাগুলি কেটে পরিষ্কার করে দেয়।

গাছের জাম শেষ হয়ে আসছে। আর দু চারদিন হয়ত বেরোনো যাবে।

—জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হয়ে এলো, বর্ষা শুরু হবে এবার—জামগাছের দিকে তাকিয়ে বলল পরান।

—একটা জিনিস বিজয়গঞ্জের হাটে গাড়ি বোঝাই করে চালান করতে দেখি পরানদা— ওই কালো কচুগাছ, এখানে তো অঢেল হয়ে আছে, তুলে বোধা বেঁধে নিয়ে গেলেই হয়। তবে খুব মোটা মোটা আর বড় বড় গাছগুলো, ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখব?

—বলতে পারিস, তবে খাটুনি আছে, গাছ কেটে বোঝা বেঁধে মাথায় করে নিয়ে ট্রেনে তোলা, তারপর ট্রেন থেকে নেমে আবার মাথায় করে নিয়ে হাটে —

—খাটুনিকে আমি ভয় পাইনা পরানদা— দৃঢ় গলায় বলল বসন্ত।

—আষাঢ় মাসে বৃষ্টি শুরু হলে কচু গাছগুলো তরতারিয়ে বড় হয়ে উঠবে— বলল পরান।

—তুমি এসব মাসের হিসেব কি করে রাখো? জিজ্ঞাসা করল বসন্ত।

—কেন? ঘরে একটা ক্যালেন্ডার ঝোলানো আছে দেখিসনি? কি ছেলেরে তোরা? কি লেখাপড়া শিখেছিস? তারিখ মাস এ সবের হিসেব রাখিস না?

স্কুলে যখন পড়ত বসন্ত—হোস্টেলে থাকত— তখন এ সবের খুব হিসাব রাখত। বিশেষতঃ ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার সময়—আর এখন বারের হিসাবও থাকে না। তখন কত আশা ছিল, কত স্বপ্ন ছিল ... একুশ বছর বয়স হলো তার ... এতদিনে গ্র্যাজুয়েট হয়ে যেত ... বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার ইচ্ছা ছিল তার ...

... মিনুর মনেও অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন, সেদিন কি কথায় যেন মাকে বলছিল—আমি যখন কলেজে পড়তে যাব তখন—এ সময় বসন্ত ঢুকে পড়াতে কথাটা বন্ধ হয়ে গেল। একদিন অন্তর ওদের বাড়ি যাওয়া—যাবার দিন ভোর থেকেই মনটা কেমন উসখুস করে, বেরোনোর সময় ভালো করে চুল আঁচড়ায়। রাস্তায় যেতে যেতে বুকে কেমন অস্থির ভাব। সেভাব সারাক্ষণ—যতক্ষণ না ফেরে।

পরান রাধামাসীর বড়ো খদ্দের। একদিন অন্তর দু তিন কিলো মুড়ি নেয়, সুতরাং একটু আলাদা খাতির। বসতে আসন, বাতাসা দিয়ে জল। আজ যখন বসন্ত পৌঁছাল তখন মুড়ি কমতি, দেড় কিলোও হবে না।

—বোসো বাবা বোসো, একটু সময় লাগবে। ও মিনু, একটা কাজ কর, বসন্তকে একটু দুধ দিয়ে মুড়ি দে।

দুধ দিয়ে মুড়ি! চমকে ওঠে বসন্ত, দুধ সে কবে খেয়েছে মনে পড়ে না। আজ মিনুর তৈরি ঠোঙা থাক দিয়ে সাজানো, মিনু পড়ছিল, আসনটা এগিয়ে দিয়ে উঠল।

—দুধ দিয়ে—না না, শুধু মুড়িই না হয় একটু—

—আমার ঘরের গরুর দুধ বাবা, বটের আঠার মতো, খেয়ে দেখ না কি ভালো।

ঘর থেকে বাটিতে দুধ নিয়ে মায়ের কাছ থেকে সদ্য ভাজা মুড়ি দুচার মুঠো দিয়ে মিনু বসন্তর হাতে বাটিটা ধরিয়ে দিল, সঙ্গে একটা চামচ।

কি সুন্দর গন্ধ, আর কি অপূর্ব স্বাদ! বোধহয় একটু চিনি দিয়েছে, মিষ্টি মিষ্টি!

বইগুলি নিয়ে মিনু সরে বসেছে দেওয়ালের দিকে, ওর দিকে তাকাতে হঠাৎ চোখে চোখ—মুখ নামিয়ে পড়তে শুরু করল।

মিনুর সঙ্গে তার অনেক গল্প করতে ইচ্ছা করে—স্কুলের কথা, পড়ার কথা, গ্রামের কথা—

—আচ্ছা, তোমার ক্লাস ফাইভের পুরোনো বই কিছু আছে?—জিজ্ঞাসা করল বসন্ত।

—হ্যাঁ থাকতে পারে, কেন?

—যদি দাও আমার ভাইকে পড়াব।

—একটু অবাক চোখে তাকাল মিনু, বলল—খুঁজে দেখব।

—এই পুরোনো খবরের কাগজ তোমরা কোথায় পাও?

—গ্রামে যারা কাগজ পড়ে তাদের কাছ থেকে কিনি, কেন?

—না, এমনি, আমাকে দু একটা কাগজ দেবে? পরের দিন ফেরত দেবো।

—কি হবে?

—পড়ব।

—পুরনো কাগজ পড়বেন? —হাসল মিনু—

—তাতে কি আমার কাছে তো নতুন, কাগজ পড়লে কত কিছু জানা যায়, দাও না দু একটা কাগজ।

ঘর থেকে দুতিন দিনের কাগজ এনে দিলো মিনু, বলল—আপনি অদ্ভুত মানুষ—হাসতেই থাকল।

—এতো হাসির কি আছে? একটা কাগজ তুলে নিলো সে, প্রথম পাতাতেই রক্তাক্ত ছবি—গুলিবিদ্ধ চারটি মৃতদেহ শোয়ানো, তিনজন যুবক একজন যুবতী—হেডলাইন আধা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত।

ছবির স্পর্শে সহসা বুঝি পাথর হয়ে গেছে বসন্ত—মৃতদেহের আশপাশে রক্তের স্রোত, ইতস্তত পড়ে আছে আগ্নেয়াস্ত্র, নিহত দুজন জওয়ান—তাদের ছবিও ছাপা হয়েছে তবে মৃতদেহের নয়।

—কি হলো? নির্বাক বসন্তর দিকে তাকিয়ে বলল মিনু।

—মারা গেছে দেশেরই কয়েকটি তাজা প্রাণ—ফিস ফিস করে বলল বসন্ত—এরা কে কার শত্রু? যেন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল সে, একটু স্বাভাবিক হতে চাইল, তাড়াতাড়ি কাগজ ওল্টাল, প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইল—এই যে দেশে বিদেশে কত কিছু ঘটছে জানতে ইচ্ছা করে না?

—নে রে, মুড়িটা মেপে দে—ওদিক থেকে রাধামাসী বলল, মিনু উঠে গেল।

—শ দুয়েক ঠোঙাও দিয়ে দিও—বলল বসন্ত—তার বুকটা শুকিয়ে গেছে, কেমন হচ্ছে। কাগজগুলি ভাঁজ করে ফেলল তাড়াতাড়ি, যেন কেউ দেখে ফেলবে, এক গেলাস জল দিও কোনোক্রমে বলল সে।

সে যেন আগুনের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিল। বড়ো কষ্ট হচ্ছিল তার, ওই চারজন তাদের জন্য কষ্ট, ওই সৈনিক—ওদের জন্য কষ্ট—নিহত মানুষেরা ... দিলীপ স্যার ... সকলের মুখ ভেসে উঠছিল তার সামনে, বড়ো কষ্ট হচ্ছিল, তার মনে হচ্ছিল ওই চারটি মৃতদেহের মধ্যে একটি হতে পারত তার। তাহলে? মা, বাবা, ভাই-কেমন অবস্থা হতো তাদের? কিংবা নিহত ওই জওয়ান—ওদের বাড়িতেও আছে মা, বাবা, স্ত্রী, সন্তান—তাদের কি অবস্থা আজ? কে কার শত্রু? কে কাকে মারছে?

খেতে বসে ভালো করে খেতে পারল না সে, গলার কাছে কি যেন ঠেলে আছে—খাবার নামতে দিচ্ছে না।

—কি হলো?—পরান জিজ্ঞাসা করল।

—কি জানি, শরীরটা ভালো লাগছে না।

—আজ আর তাহলে বেরোতে হবে না, সারাদিন ট্রেনে ট্রেনে ঘুরলে আরও খারাপ হবে—

—আমি তাহলে একাই যাই না, তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব, জামগুলো পাড়া হয়েছে—ভরত বলল।

—যাবি? চল্! নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তো!

—না, বেরিয়েই পড়ি, কষ্ট করতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে গেলে কষ্ট করতে হবে।

—দেখ, যা ভালো বুঝিস—পরাণ অনিচ্ছুক ভাবে বলে।

নির্বাসিত এই জীবনে চলতে চলতে পদে পদে বসন্তর মনে হয় তাদের ওই দূর গ্রামগুলিতে কিছু করে রোজগার করার সুযোগ নেই। দূর জঙ্গলের মধ্যে ছোটো ছোটো গ্রামগুলিতে আরও সুযোগ কম। অথচ একটু বাইরে এইসব দিকে কত মানুষ নানা ভাবে করে খাচ্ছে।

ট্রেনে ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে এ স্টেশন ও স্টেশনে নামে ওরা, স্টেশনের দোকানপাট, চাওয়ালা কতজন—অনেকে বাঙালি নয়, হিন্দি ভাষী এসব মানুষ অন্য রাজ্য থেকে এসে কেমন পরিশ্রম করে রোজগার করছে। এমনকি পরাণদা যেখান থেকে মালপত্র কিনতে যায় সেই গঞ্জের দোকান ও ব্যবসায় অনেক অন্য রাজ্যের লোকের। এরা কত দূর থেকে এসে নিজের চেষ্টায় সব গড়ে তুলেছে! তাহলে সে-ই বা পারবে না কেন?—কিছু একটা করতে হবে—তার মনে হয়—নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। ওইতো—রাধামাসী, ওইতো মিনু—ওরাও তো চেষ্টা করছে!

একটু বিকাল বিকাল ফেরে ওরা, বিক্রি শেষ। পরানদা আরও পরে ফিরবে। কাগজগুলি নিয়ে ঝিলের ঘাটের ধারে গিয়ে বসে বসন্ত। এখানে আলো বেশি। কাগজগুলি ঠিক পরপর তিন দিনের নয়, দু চারদিনের আগে পিছের। প্রত্যেকটা কাগজেই কম বেশি ওইরকম খবর আছেই।

—বেড়ে উঠছে হিংসা, হিংসা, হিংসা—ভাবল সে, বুকের মধ্যে আবার বেড়ে উঠছে কষ্ট—এর বদলা প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা। এর কোথায় শেষ? কি সমাধান?—সে ভাবতে পারে না—কিন্তু এটাও ঠিক পথ নয়—এটাই মনে হয় তার। সারাক্ষণ মাথার মধ্যে ওই এক চিন্তা। ঘুমিয়ে পড়লে চিন্তাগুলি বুঝি চারপাশে ওৎ পেতে বসে থাকে—ঘুম ভাঙলেই ঢুকে পড়ে মাথার মধ্যে।

পরানদার ভাবনায় দোকান ঘরটা ঢুকে গেছে, সারাক্ষণ ওর মাথায় ওই এক চিন্তা—

সেদিন ঘামে ভেজা ছেঁড়া গেরুয়া জামা কাপড়টা ধুয়ে শুকোতে দিচ্ছিল উঠোনের দড়িতে, ভরত হেসেই অস্থির—ওটা কি হবে?

—কখন দরকার লাগে! জানিস তো ভিক্ষে ছেড়ে যেদিন ঝালমুড়ি বিক্রি শুরু করলুম মা ওটা কেচেকুচে শুকনো করে তুলে রাখছিল, দেখে বললুম—ওটা আর কি হবে মা? মা বললে—যদি তোর মুড়ির ব্যবসা না চলে তখন তো আবার লাগবে। যাই হোক ওটা আর লাগেনি, কিন্তু হঠাৎ সেদিন তো কাজে লেগে গেল, তোদের বাড়ি গেলুম।

—তাই বলে আবার একদিন তুমি ওসব পরে আমাদের বাড়ি যাবার মতলব করবে না কিন্তু—আমি বারণ করে দিচ্ছি—রাগত ভাবে বলল বসন্ত।

সেদিন ভরত আর বসন্তকে পাশে বসিয়ে কত কথা বলল পরাণ—দেখ, একা একা ছিলুম সে এক রকম। জীবনে আবার নতুন রকম কিছু ঘটবে ভাবিইনি। কিন্তু তোরা এলি, তোদের দায়িত্ব আপনা থেকেই এসে পড়ল ঘাড়ে, একটা ভালোবাসা—একটা টান জন্মে গেল—বলতে বলতে গলা ধরে এলো পরাণের, একটু চুপচাপ থেকে নিজেকে সামলে বলে চলল—মায়ের ইচ্ছা ছিল একটা ঝুপড়ি দোকানঘর করার, তা আমি একা এ বয়সে ওসব করে উঠতে পারব? করেই বা হবেটা কি, বেশ তো চলে যাচ্ছে একটা পেট, পোস্ট অফিসে টাকা জমে যাচ্ছে। এখন তোদের নিয়ে যদি কিছু করতে পারি, সারাদিন এই ভাবনা—একটু চুপ করে রইল পরান, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—কিন্তু তোরা কি আর আমার কাছে চিরকাল থাকবি!

দু ভাই কেউ কিন্তু বলতে পারল না—হ্যাঁ থাকব পরাণদা। দুজনেরই বুকের মধ্যে ভেসে উঠল মায়ের মুখ, বাবার মুখ, সেই বাড়ি ঘর, সেই বাড়ির সামনে নিমগাছ...

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, পরাণদার ফিরবার সময় হলো, ভাত বসাতে হবে—খবরের কাগজগুলো ভাঁজ করে উঠল বসন্ত, মন স্থির করে ফেলল—পরাণদাকে বলবে—আমি তোমার সঙ্গেই থাকব পরাণদা—চিরকাল।

এই ক-মাসের ব্যবসায় জমে গেছে তিন হাজার টাকার ওপর! এতো টাকা একসঙ্গে! ভাবাই যায় না! এ টাকাটা পরাণদার হাতে তুলে দিতে হবে।

ঘরে এসে কাগজগুলো যত্ন করে তুলে রাখল, মিনুকে ফেরৎ দিতে হবে।

এগারো

একটা জাম ঝুড়ি থেকে তুলে নিয়ে মুখে ফেলে সামনে দাঁড়িয়ে অজিত। আগুনঝরা চোখে বসন্তর চোখের দিকে তাকিয়ে সে। বসন্ত যেন পাথর হয়ে গেল। হু হু করে ট্রেন ছুটছে, অস্তগামী সূর্যের আলো সোজা জানালা দিয়ে এসে পড়ছে অজিতের মুখের ওপর, কি কঠিন কঠোর ওর মুখের ভঙ্গিমা! বসন্ত তাকিয়ে থাকতে পারল না।

—কলকাতা গিয়েছিলাম একটা কাজে—বলল অজিত, মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখল—পালিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত ট্রেনে জাম বিক্রি করছিস? বাঃ! বাঃ!

ঝুড়িতে সামান্য কটা জাম পড়ে আছে, একটু পরেই চলে আসবে রাণীঝিল—

তাদের বাসভূমি, নেমে পড়বে, কিন্তু তার আগেই এই বিপত্তি।

—আমার ভালো লাগছিল না, কষ্ট হচ্ছিল।—বলল বসন্ত।

—কষ্ট তো হবেই, কষ্টের জন্যেই তো লড়াই—অজিতের কণ্ঠস্বর কি কঠিন!

ভরত ছিল কামরার ওদিকে, এদিকে আসতে গিয়ে ওদেরকে দেখে থমকে গেল, তার মনে কেমন এক কু সংকেত,—সে আর এগোলো না।

—তোকে তো ফিরতে হবে বসন্ত!—চাপা গলায় বলল অজিত।

—না না, আমি পারব না,—অসহায়ভাবে বলল বসন্ত।

স্টেশন এসে গেছে, সে ফিরল, দ্রুত নেমে পড়ল, কিন্তু অজিতও নেমেছে পিছু পিছু।

—এখানে থাকিস?

—হ্যাঁ।

—কোথায়? ওই গ্রামে?

—ন্ না, এই রেললাইনের পাশে একটা কুঁড়েতে, একজনের আশ্রয়ে।

—চল্, দেখে যাই তোর আস্তানা।

বসন্ত দাঁড়িয়ে।

—চল্ কঠিন গলায় হুকুম দিল অজিত।

বসন্ত চলতে শুরু করল, পা যেন চলছে না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁদিকে ঘুরল।

—তোর লেখাপড়া কেন হল না বসন্ত?

—টাকার অভাবে।

—কেন অভাব?

—কেন? আমরা গরীব তাই।

—না, আমাদের বঞ্চনা করে কিছু মানুষ বহাল তবিয়তে আছে, তাই আমাদের পাওনা আমাদেরই ছিনিয়ে আনতে হবে, ভুলে গেলি?

—কিন্তু—এভাবে—কত নিরীহ গরীব মানুষ—আমাদেরই ভাই—মরছে—কোনোরকমভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল বসন্ত—ভীত সন্ত্রস্ত সে।

—কে নিরীহ, কে নির্দোষ সে ঠিক করার ভার তোমার নয়, তুমি মুক্তি যোদ্ধা, আদেশ পালন করবে শুধু।

—কিন্তু আমি, আমি পারছিলাম না।

—বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি কি জানা নেই?

—আমাকে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তো কারো কোনো ক্ষতি করিনি। বিশ্বাসঘাতকতা করিনি—মিনতি করল বসন্ত। ঘরের সামনে পৌঁছে গেছে ওরা।

—এই ঘর!—চারিদিক তাকাল অজিত, ওপরের দিকে তাকিয়ে রেল লাইন দেখল, কি যেন ভাবল, বলল—ঠিক আছে।

দ্রুত পায়ে ফিরে চলল, শক্তিহীন বসন্ত দুয়ারে বসে পড়ল।

ট্রেন থেকে ভরতও নেমেছিল। কিন্তু কাছে আসে নি। ও কে? মনে হচ্ছে ওদের কাছেই দাদা থাকত, ও কি দাদাকে ধরে নিয়ে যাবে? আমাকে পেলে আমাকেও ধরে নিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি একটা থামের আড়ালে লুকিয়েছিল সে। ওরা চলে গেলে দূর থেকে দেখল।

কিছুক্ষণ পর লোকটিকে ফিরতে দেখল সে, আড়ালে সরে গেল আবার। লোকটি প্লাটফরমে কিছুক্ষণ পায়চারি করল, তারপর হেঁটে চলে গেল প্লাটফরমের প্রান্তে, সেখানে রেলিং-এর ধারে গিয়ে দূরের দিকে কি যেন দেখল।

বোধহয় আমাদের ঘরটাই, দেখছে—ভাবল ভরত। আবছা অন্ধকার নামছে। প্লাটফরমে আলো জ্বলে উঠল। আলো থেকে পিছিয়ে অন্ধকারে দাঁড়াল লোকটি, দাঁড়িয়েই থাকল। ভরত আড়াল থেকে দেখতেই থাকল।

কতক্ষণ পর ট্রেন এলে উঠে পড়ল লোকটি। ভরত হাঁফ ছেড়ে ছুট দিল ঘরের দিকে। হাঁফাতে হাঁফাতে হতভম্ব দাদার কাছে এসে দাঁড়াল ভরত, বলল—দাদা, দাদা, ওরা আমাদের ধরে ফেলেছে তাই না?

—হ্যাঁ ধরে ফেলেছে।

—কি হবে দাদা? আমাদের কি ধরে নিয়ে যাবে জঙ্গলে?

—আমরা যাবো না ভরত, আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। একটা কথা—যদি দেখিস ওরা আমাকে কোনো বিপদে ফেলেছে—তুই কিন্তু কাছে আসিস না, পালাবি। সবচেয়ে ভালো হয় ওদের চোখে না পড়া, ও বুঝতে পারেনি তুই আমার সঙ্গে আছিস। হয়ত আমি মারা যাব, কিন্তু তুই পালিয়ে যাস্, যেখানে হোক— যেভাবে হোক পালাবি।

বারো

গাছের জাম শেষ, কদিন ধরে বেরোনো বন্ধ। দিনের অনেকটা সময় পড়াশোনায় ব্যয় হচ্ছে। ইতিমধ্যে একদিন বিজয়গঞ্জে গিয়ে কালোকচুর গাছের যোগানদারদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে এসেছে বসন্ত, কোনো অসুবিধা নেই বোঝা বেঁধে নিয়ে গিয়ে ফেললেই হলো, তবে বড় বড় মোটা মোটা হওয়া চাই। ছোট ছোট গাছ গাড়ি ভাড়া দিয়ে নিয়ে গিয়ে পোষায় না, বাজারও নেই। অবশ্য হাতে হাতে পয়সা! দাম যদিও খুবই কম! কিন্তু ওদেরও তো গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে যেতে হবে সেই কোলকাতায়। দমদমের বাজারে না কোথায় যেন বলছিল।

অতঃপর একদিন কচুগাছ তুলে বোঝা বেঁধে পরদিন ভোরবেলা বেরিয়ে দিয়ে এলো বসন্ত। সত্যি খুব খাটুনি। তা হোক, বিনা পয়সায় শুধুমাত্র পরিশ্রম দিয়ে আয়। ওটা দিতে গিয়ে আরেকটা জিনিসের খোঁজ পেয়ে গেল - কচুর লতি - ওই কচু গাছের গোড়ায় গোড়ায় মোটা মোটা লম্বা লম্বা শিকড়ের মতো জন্মায়, ওগুলির দাম ভালোই, ভারও কম! যাইহোক, দুই মিলে আরেকটা আয়ের রাস্তা পাওয়া গেল।

একদিন অন্তর মুড়ি আনতে গিয়ে কয়েকটা করে খবরের কাগজ চেয়ে আনে বসন্ত, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে, কিছু কিছু অংশ ভরতকে পড়ায়। ক্লাস ফাইভের কিছু বই খুঁজে পেতে দিয়েছে মিনু। সেদিন ভরতকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল মুড়ি আনতে, দেখে মাসী বলল—এটি আবার কে?

—আমার ভাই—বলল বসন্ত। ভরত তার পিছনে প্রায় মিশে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিল।

—ও মা! পরানের তিনকুলে কেউ ছিল না, হঠাৎ একটা ভাই বেরোলো, এখন সে ভায়ের দেখি আবার একটা ভাই বেরিয়েছে! ব্যাপারটা কি? আরও আছে নাকি?—মাসীর কণ্ঠস্বরে কেমন রহস্য—তোমাদের কিন্তু পরাণের মতো দেখতে নয় বাপু, তোমাদের দুভায়ের চেহারা অন্য রকম।

—হ্যাঁ, আমরা দুভাই—নিজের ভাই, পরাণদা মাসতুতো ভাই।

—তোমার দুধ মুড়ির খদ্দের বাড়ল মা!—মিনু হেসে হেসে বলল।

—দে দে, ওদের একটু দুধমুড়ি দে, রোজ কি আর দিচ্ছিস!

—আমাকে দিতে হবে না—বসন্ত বলতে গেল—

—কম পড়বে না! একটু না হয় জল মিশিয়েই দেবোখন—মিনুর তরল গলা।

—তোমার নাম কি?—রাধামাসী জিজ্ঞাসা করলেন।

—ভরত।

—রামের ভাই লক্ষ্ণণ, তার ভাই ভরত, হাসতে হাসতে ঘরে চলে গেল মিনু, একগোছা বই নিয়ে এসে ভরতের হাতে দিল, বলল—এই নাও তোমার জন্য বই খুঁজে রেখেছি।

অঙ্ক ইংরাজী সহ অনেকগুলি বই পাওয়া গেছে। বইগুলি মোটামুটি অক্ষত। বই-এর যত্ন নেয় মিনু বোঝা যায়। হাতের লেখাও সুন্দর। প্রত্যেক বই মলাট দেওয়া, তার ওপর নাম, স্কুলের নাম, শ্রেণী সুন্দর করে লেখা।

সেরকম কোনো বিপদ ঘটেছে দেখলে ওদের বাড়ি প্যালিয়ে যাবি, খবরদার আমার সঙ্গে জড়াবি না—বারবার সাবধান করে বসন্ত—এ জন্যই তোকে ওদের বাড়ী নিয়ে গেলুম, রাস্তাঘাট ভালো করে চিনে রাখ, আমার মন বলছে ও আবার আসবে—ফেরার পথে ভরতকে বোঝাল বসন্ত।

খবরের কাগজগুলি আগাগোড়া পড়ে বসন্ত। অনেকদিন দেশ বিদেশের খবর থেকে বিচ্ছিন্ন সে। দুর্নীতি দুর্নীতি আর দুর্নীতি! দুর্নীতিতে বোঝাই দেশ। মিলিটারি থেকে শুরু করে খেলাধূলা,—বন্যা থেকে খরা, ওষুধ থেকে খাদ্য—সর্বত্র দুর্নীতিতে জড়িয়ে বড়ো বড়ো মাথা। অথচ কোনো গ্রেপ্তার নেই, শাস্তি নেই। শুধুই তদন্তের আশ্বাস আর প্রবোধবাক্য—'দোষীদের শাস্তি হবেই, কাউকে ছাড়া হবে না!' হাজার হাজার কোটি টাকা তছনছ হয়ে যাচ্ছে।

অথচ কত মানুষের নুন ভাতও জোটে না। কিন্তু অস্ত্র কি নিশানা করতে পেরেছে ওইসব পিশাচদের?—ভাবে বসন্ত, মাথা ঝন্‌ঝন্ করে, দ্রুত হয় শরীরের রক্তস্রোত।

অথচ কত গরীব অসহায় ভাইয়ের রক্তে রাঙা হয়ে উঠছে লালমাটি ... রক্তে রাঙা হয়ে উঠছে শালবনের ঝরা পাতা ... শষ্যক্ষেত ...

ঘাটে নেমে মুখে ঘাড়ে জল থাবড়ায় বসন্ত, উদাস বসে থাকে কিছুক্ষণ। অবাক ভরত ডাকে— দাদা, এই দাদা—

... কেমন আছ তুমি, মা? আমি তোমার জন্য তুলে আনতে পারিনি ক্ষেতের ফসল ... তোমার সহায় হতে পারিনি ... পারব মা, আমি পারব, আমাকে পারতেই হবে।

...কেমন আছ তুমি বাবা? ... বর্ষা আসছে, বাবা ঘরে ফেরার সময় হলো ... এতদিন বিভূঁয়ে পড়ে থেকে অত পরিশ্রম করে ক টাকাই বা ঘরে আনতে পারে বাবা!... পাথর খাদান ... সে ও এক বিচিত্র শোষণের জগৎ! বাবার কাছে যতটুকু শুনেছে সে তাতেই বুঝেছে ... গরীবের সহায় কেউ নেই!

ভরত নেমে আসে ঘাটে। ভয়ে ভয়ে দাদাকে ঠেলা দেয়—এই দাদা—সম্বিৎ ফেরে বসন্তর, উঠে আসে ধীর পায়ে ... ভরতের পড়াশোনাটা এগিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। এ গাঁয়ে হাইস্কুল রয়েছে, ভরতকে যদি ভর্তি করে দেওয়া যেত! কিন্তু সে হয় না। কোথাকার কে, বাবার নাম কি? পরিচয়পত্র—পুলিশের খাতায় সে এক ঘরছাড়া পলাতক দেশদ্রোহী। তাদের নিশ্চয় ধারণা—সে আছে জঙ্গলে, সঙ্গে নিয়ে গেছে ভাইকে চরবৃত্তি করার জন্য। অথচ ওদেরই ভয়ে সে কাঁটা হয়ে আছে—কখন না কখন এসে পড়বে।

এসেই পড়ল একদিন। তখন দুপুর, বসন্ত বাসন মাজছিল ঘাটে বসে, ভরত ঘরে ঘুমিয়ে। অজিতের বেশ হাটুরেদের মতো, পরনে খাটো ধুতি, ময়লা শার্ট, কোমরে গামছা বাঁধা, মাথায়ও একটা ছোটো গামছা জড়ানো কপাল ঢেকে, তার ওপর একটা ঝাঁকা—দুহাতে ধরে রেখেছে। ভরত উঠে দাঁড়াল।

—চল, ঘরে যাই—বলল অজিত— কথা আছে।

—না না, ঘরে লোক আছে, সে কিছু না জানাই ভালো—ভয়ার্ত গলায় বলল বসন্ত—পিছন দিকটা যাই, গাছপালার আড়ালে।

ঝাঁকা নামিয়ে জাম গাছের নিচে বসল ওরা, গাছের নিচটা যদিও ফাঁকা, চারপাশে ঝোপঝাড়।

—তোর ওপর একটা দায়িত্ব পড়েছে—চোখে চোখ রেখে বলল অজিত।

—আমার ওপর? আমি কি করব?

—আমাদের চারজনকে ওরা কুকুরে মতো গুলি করে মেরেছে, তার বদলা চাই, যে বদলা দেখলে ওদের রক্ত হিম হয়ে যাবে।

—হিংসার বদলা প্রতিহিংসা! তার বদলা, বদলার বদলা, শুধুই রক্ত—

—তোর বক্তৃতা শুনতে আসিনি। যা বলছি শোন, ঠিক করা হয়েছে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন যাওয়ার সময় লাইন উড়িয়ে দেওয়া হবে, ট্রেন ছিটকে পড়বে—

—কি? —স্তম্ভিত বসন্ত—কত নিরীহ সাধারণ মানুষ শয়ে শয়ে মারা যাবে, কি ভয়ানক—

—চুপ! এই রেললাইন ধরে কিছুটা গেলেই একটা কালভার্ট আছে, বর্ষায় ঝিলের জল বেশি হলে ওদিকে চলে যায়, যাতায়াতের পথে আমরা কদিন ধরে ভালো করে দেখে নিয়েছি, ওই কালভার্টের ওখানে লাইন ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে যখন ওর ওপর দিয়ে পাশ করবে এক্সপ্রেস। রোজ রাত দুটো নাগাদ এখন দিয়ে পাশ করে যে গাড়িটা—

—না না, এ ঠিক নয়, এ আমি পারব না।

—চুপ! না করলে আমিই করব, কিন্তু তোর মাথায় গুলি পুরে দেওয়া হবে। শোন, ডিনামাইট রাখা হবে কালভার্টের নীচে, তার কানেকশান চলে আসবে ঘরের মধ্যে। ট্রেনের ইঞ্জিন যখন ঘরের কাছাকাছি তখন ট্রেনের মাঝখানটা ঠিক কালভার্টের ওপর, তখন চার্জ করবি। তারপর পালাবি। যেদিকে তোর খুশি, আমরা আটকাবো না।

—আমি—আ-মি—

—আমি হেল্প করব, ডিনামাইট বসানো তার কানেকশান—তুই শুধু চার্জ করবি। আজ রাতেই কাজটা করতে হবে। সব সরঞ্জাম আছে এই ঝাঁকার মধ্যে।

—কিন্তু অজিত কত নিরীহ মানুষ মারা যাবে—কত শিশু—তারা তো কোনো দোষ করেনি!

—দোষ তো আমরাও করিনি, আমাদের মারতে শুরু করেছিল কারা? মানুষকে মেরে শয়ে শয়ে ঘর জ্বালিয়ে গ্রামকে গ্রাম শ্মশান করেছিল কারা? মাটির নিচে আছে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ—সে সব ওদের চাই। তাই মারো, তাড়াও, উন্নয়নতো নেই উল্টে শোষণ।

—আমাদের এলাকায় ঠিক ওরকম ব্যাপার নয়।

—এলাকা বলতে কি বোঝো তুমি? তোমার গ্রাম? তোমার জেলা? তোমার রাজ্য? তোমার দেশ? জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, চিকিৎসা নেই, শিক্ষা নেই, রাস্তা নেই, কাজ নেই, খাবার নেই—নেই! নেই! নেই!—উত্তেজনায় কাঁপে অজিত।

—এতো আমরা পদে পদে জানি, কিন্তু তার জন্য আমরা আমাদের ভায়েদের মারছি কেন? তাদের রক্ত দিয়ে কি আমরা এ সবের প্রতিকার করতে পারব?

—ভায়েদের লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভায়েদের বিরুদ্ধে, এটা ওদের একটা চাল, তাই ভায়েদের রক্তপাত। লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, ওদের ঘুম কেড়ে নিতে হবে, যেভাবেই হোক।

—তার জন্য ট্রেন ওড়ানো? আমাদের উর্দ্ধতন নেতারা এই ডিশিসন নিয়েছেন। নাকি তোরা ঠিক করেছিস?

সহসা রিভলভার বার করল অজিত, নিষ্ঠুর গলায় বলল—আর কোনো কথা নয়, চল্ ঘরে চল্ ওঠ—খোঁচা মারল, ঝাঁকাটা তুলে দিলো বসন্তর মাথায়।

উঠল বসন্ত, এগিয়ে চলল, পিছনে অজিত। ঘরে ঢুকে দেখা গেল কেউ নেই, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বসন্ত, ভরত নিশ্চয় বুঝতে পেরে ঠিক সময় পালিয়েছে। ঝাঁকাটা বিছনার ওপর নামিয়ে রাখল।

—তুই যে বললি ঘরে লোক আছে?

—ভেবেছিলাম ফিরেছে, কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম।

—কি করে সে? কখন আসতে পারে?

—ঠিক নেই, যে কোনো সময় ফেরে।

—কি করে বললি না তো?

—ওই আমার মতো—এটা ওটা বিক্রি করে।

—ঠিক আছে। অপেক্ষা করা যাক, ওইখানে বোস—মেঝের এককোণ নির্দেশ করল অজিত, নিজে পা ঝুলিয়ে বিছানায় বসল।

—অজিত, তুই এ কাজ করিস না অজিত, ফিরে যা—মিনতি করল বসন্ত।

—সবাই চাইছে আমরা ফিরে যাই। কি যেন বলে ওরা—স্বাভাবিক জীবনে! ব্যঙ্গের হাসি হাসল অজিত— এত বছর ধরে কি পেয়েছি আমরা? এখন আগুন জ্বলেছে তাই টনক নড়েছে, বলছে উন্নয়নের কথা, কে চায় অস্বাভাবিক জীবনে বাঁচতে? স্বাভাবিক জীবন! মানে, নিজেদের অধিকার ছেড়ে, পরিচয় ঘুচিয়ে দিয়ে হয়ে যাও দিনমজুর! —কে?

দরজা ঠেলে ঢুকল পরাণ, তার সামনে উদ্যত রিভলভার। ঘরের ভেতর আধো অন্ধকার, তবুও পরাণের বুঝতে অসুবিধা হলো না। জীবনে প্রথম দেখা এ জিনিসটা কি।

—তোমার ওই বোঝাটা নামাও।

কি কঠিন কণ্ঠস্বর! কাঁপতে কাঁপতে ঝালমুড়ির বোঝা নামাল সে।

—চুপচাপ দাঁড়াবে, কোনোরকম নড়াচড়া নয়।

সন্তর্পণে রিভলভারটা রেখে মাথার গামছাটা খুলল অজিত, গামছাটা লম্বালম্বি তিন ফালা করে ছিঁড়ে ফেলল, একটা টুকরো পরাণের দিকে এগিয়ে ধরে বলল—এটা দিয়ে বসন্তর মুখটা বাঁধো।

—এ কি—বসন্ত উঠতে চাইল।

—একেবারে চুপ করিয়ে দিই? —ধমকে উঠল অজিত। পরাণের দিকে চেয়ে বলল—তাড়াতাড়ি, ভালো করে দুপাক জড়িয়ে বেশ টাইট করে বাঁধা চাই, নাকের নিচ দিয়ে—

পরাণ ঘেমে গেছে, তবু আদেশ পালন করল। —এবার হাত দুটো বাঁধো, পিছন দিকে, টাইট করে, তারপর পা দুটো।

কাজ শেষ হলো পরাণের, নেতিয়ে বসে পড়ল। কোমরের গামছাটা খুলে একই ভাবে তিন ফালা করল অজিত, পরাণের মুখ হাত পা বেঁধে দিল। দুজনকে দুদিকের মাচার কাছে ঠেলে দিল, ঘরের এদিক ওদিক দেখে একটা গামছা পেয়ে গেল, সেটাকে লম্বালম্বি দু ফালা করে দুজনকে দুটো মাচার খুঁটিতে বাঁধল। ওদের সব বাঁধনগুলি আরও শক্ত করে দিল।

—শুধু শুধু আমি তোমাদের মারতে চাই না, তোমরা আমার কোনো ক্ষতি করনি, কাজটা আমাকে একাই করতে হবে তাই এসব করতে হলো, তোমরা সহযোগিতা করলে এসব করতে হতো না।

বাইরে ততক্ষণে অন্ধকার নেমেছে। চুপচাপ কাটল কিছুটা সময় অন্ধকার আরও গাঢ়, বেড়ে উঠছে ঝিঁ ঝিঁর ডাক, বাঁশি বাজিয়ে চলে গেল একটি ট্রেন, আবার সব নিস্তব্ধ।

পরাণের মাথা ঝুলে পড়েছে—অন্ধকারেও বুঝতে পারল বসন্ত।

ছোট্ট একটা টর্চ জ্বালল অজিত, ঝাঁকার জিনিসপত্র নামিয়ে ঠিক ঠাক করতে লাগল। একটা তারের কয়েলে সংযুক্ত ডিনামাইট নিয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিল বাইরে, এদিক-ওদিক দেখে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলল। ঘরের পিছনে গিয়ে জানালা দিয়ে তারের প্রান্ত ভেতরে ঢুকিয়ে দিল সে তারপর তার ফেলে ফেলে এগিয়ে চলল গুঁড়ি মেরে। এখানে বড়ো গাছপালা কিছুই নেই, শুধুই ঝোপঝাড়, খুবই ঝাপসা দেখা যাচ্ছে সবকিছু—অবশেষে কালভার্টের কাছে।

পলক মাত্র টর্চের আলো ফেলে কালভার্টের বাঁধানো ঢালু পাড় দেখে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে গেল সে, ডিনামাইট রেখে দিল কালভার্টের খাঁজে। এটা ডাউন লাইন, এ লাইনেই ফিরবে এক্সপ্রেস।

ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে যতটা সম্ভব দ্রুত ফিরল সে, ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল, টর্চ জ্বেলে জানালায় গলানো তার টেনে নিয়ে কানেকশন করল মাচায় রাখা যন্ত্রপাতিতে।

মোবাইল ফোনের বোতাম টিপলে ঘরে সামান্য আলো, সেটা ঘুরিয়ে সব কিছু দেখে নিল সে, মাচায় বসল, নম্বর টিপে টিপে ফোন,—চাপা গলায়—হ্যাঁ, কাজ সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, এখন অপেক্ষা—ফোন বন্ধ করল।

... অপেক্ষা ... অপেক্ষা ... অ-পে-ক্ষা ... সময় এত দীর্ঘ! কাঁধ দুটো যন্ত্রণায় ভেঙে যাচ্ছে, গুন গুন করে কাতর শব্দ করে ফেলল পরাণ।

—চুপ, একদম চুপ—চাপা গলায় ধমক দিল পরান। লোকাল ট্রেনের বাঁশি শোনা গেল, ঝমঝমিয়ে চলে গেল ট্রেন।

মোবাইলে আবার চাপা গলায় কথা বলল অজিত—হ্যাঁ, চলে গেল লাস্ট ট্রেন, এখন বারোটা দশ, আরও দু ঘন্টা।

... অপেক্ষা ... অপেক্ষা ... অপেক্ষা ... পরাণদা কি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি অজ্ঞান হয়ে গেল?—ভাবল বসন্ত, অন্ধকারে তাকিয়ে থাকলে চোখ টনটন করে, চোখ বুজিয়ে বসেছিল সে, শরীরের যন্ত্রণাটা সয়ে এসেছে, মাথায় হাজার চিন্তা, মাথা তো কখনো খালি যায় না! কিভাবে ছিটকে পড়বে ট্রেন ... আহত মানুষের আর্তনাদ ... জীবিত মানুষের চিৎকার ...

সহসা চোখে আবছা আলো—চোখ খুলল বসন্ত—সাইলেন্ট করা মোবাইল জ্বলে উঠেছে—না, এখনো ট্রেনের আওয়াজ নেই, লেট মনে হচ্ছে—তিনটে বেজে গেল—চাপা গলায় বলল অজিত।

সে কি! তিনটে বেজে গেছে! হতে পারে ট্রেন 'লেট'-এ চলছে। ভাবল বসন্ত—

যদি ট্রেনটা পাঁচ ছ ঘন্টা লেট হয়! আহা কি ভালোই হয়! কিন্তু তার আগে চলে আসবে লোকাল ট্রেন ...

প্রথম ট্রেন খুব ফাঁকা থাকে! ... অপেক্ষা ... আরও কত সময় বয়ে যায়!

জানালা বলতে বাঁশের ফালির ফাঁক— সেখান দিয়ে খুব হাল্কা আকাশের আভাস চোখে পড়ল বসন্তর, ভোর হচ্ছে কি?

নিঃশব্দ মোবাইলে আবার আলো—না, কোনো ট্রেন আসেনি, দুটো লোকাল ট্রেন যাওয়ার সময় চলে গেছে অনেকক্ষণ—চলে যাবো?—টাইমারে আধ ঘন্টা 'সেট্' করে দিয়ে যাচ্ছি।

কাজ সেরে দরজা সামান্য ফাঁক করে চোখ লাগিয়ে বাইরে তাকাল অজিত, খুবই সামান্য আলোর আভাস, উবু হয়ে বসে দরজা খুলে এগোল সে, গুঁড়ি মেরে উঠোনে নামল, এবং সেভাবেই নেমে গেল ঘাটের দিকে ঝিলের ধারে, হাতে মুখে জল দিল সামান্য, শব্দ করল না।

ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল যে দূরে স্টেশনের আলোগুলি জ্বলছে, সাবধানে নীচু হয়ে একটু একটু করে এগোতে লাগল, কিছুটা এগিয়ে সোজা হয়ে চলতে শুরু করল রাস্তার ধারে বটতলায় এসে একটু থামল সে। তাকিয়ে দেখল প্লাটফরমের ওপর মানুষের জটলা। দ্রুত পায়ে গ্রামের পথ ধরল সে।

তেরো

ঘর থেকে ভরত কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছিল। ঘরের পিছন দিকে দাদার কাকুতি মিনতি এবং আগন্তুকের ধমকানি। লাইন ওড়ানো—বোমা মেরে—রাত্রি দুটো—এসব শুনতে শুনতে তার মনে ভীষণ ভয়—এবার ও দাদাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে, তাকে পেলে তাকেও ধরবে। দরজাটা ভেজানো ছিল, সাবধানে ফাঁক করে এদিক ওদিক দেখে সে বেরিয়ে পড়ল, কিছুটা এগিয়ে দে ছুট, থামল একেবারে বটতলায়।

বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য রাখছিল ঘরের দিকে, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আবছা আলোয় একটু পরে ওদের দুজনকে ঘরে ঢুকতে দেখল সে, মনে হলো লোকটার মাথায় যেন কি।

ও কি দাদাকে মারবে? গুলি করবে? না কি ধরে নিয়ে যাবে? কিছুক্ষণ কেটে গেল কেউ বেরোল না। গুলি করলে তো আওয়াজ পাওয়া যাবে—ভাবল সে, তখন দেখল পরানদা ফিরছে।

পরানদার কাছে ছুটে গেল সে—একটা লোক ঢুকেছে ঘরে। দাদাকে মারছে নাকি জানি না—কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল।

—কি বাজে বকছিস, চল্‌তো দেখি—বললো পরাণ।

—না আমি যাবো না, দাদা বারণ করেছে, আমাকেও মারবে।

—কি মুশকিল! আচ্ছা আমি দেখছি—বলে এগোলো পরাণ।

ভরত বটগাছের তলায় বেদীতে গিয়ে বসল, দেখল পরাণদা ক্রমশ ঝাপসা, মনে হয় যেন ঘরে ঢুকল।

তারপর কতক্ষণ কেটে গেছে, রাত্রি নেমেছে। খিদে পাচ্ছিল ভীষণ, কিন্তু ঘরে যেতে ভরসা পাচ্ছিল না, দাদাও বারণ করে রেখেছে। অনেকক্ষণ পর তার মনে হলো রেলগাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার কথা, কোথায় যেন বোমা রাখবে—সে উঠল দ্রুত পায়ে ছুটল স্টেশনে। স্টেশন ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল টেবিলে বসে কি যেন করছেন মাস্টারবাবু।

—বাবু, ও বাবু—দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল ভরত।

—কি চাই—আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে উঁকি দেওয়া এক কিশোরের মুখ দেখলেন স্টেশনমাস্টার।

—ওই ওরা রেললাইনে বোমা রেখেছে, রেলগাড়ি উড়িয়ে দেবে।

—কে রে? কারা? ভেতরে আয়—হতচকিত হয়ে টেবিল ছেড়ে এগিয়ে আসতে চাইলেন।

—আমার নাম বলবেন না, তাহলে আমায় মেরে ফেলবে—বলতে বলতে ছুটল কিশোর, মাস্টারমশাই দ্রুত বেরিয়ে এলেন, ছেলেটি প্লাটফরম ধরে ছুটে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে, তিনিও ছুটলেন, কিন্তু সিঁড়ির মুখে এসে যখন দাঁড়ালেন দেখলেন ছেলেটি দ্রুত মিলিয়ে গেল গ্রামের পথে।

দিনকাল খুবই খারাপ, কারো কথাই অবহেলা করা উচিত নয়—ভাবতে ভাবতে মাস্টারমশাই সামনের এবং পিছনের দুদিকের স্টেশনেই জরুরী খবর পাঠালেন, দুদিক থেকেই কোনো ট্রেন না ছাড়ার ব্যবস্থা করলেন, তারপর যথাযথ জায়গায় খবর পাঠাতে শুরু করলেন বম্ব স্কোয়াডের লোক পাঠানোর জন্য যারা আগের স্টেশন থেকে লাইন পরীক্ষা করতে করতে আসবে। বাচ্চা ছেলের কথা বলেই বেশি বিশ্বাসযোগ্য, নিশ্চয় শুনেছে কাদেরও গোপন পরামর্শ। আপ ডাউন দু লাইনেই পরীক্ষা পর্ব শুরু হয়েছে মধ্যরাতে। সারারাত কেটে গেছে অফিসে বসেই, কোয়ার্টারে আর যাওয়া হয়নি, কখন কি খবর আসে! এভাবে ভোর। চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল, হঠাৎ বিস্ফোরণের আওয়াজ, ভীত সন্ত্রস্ত মাস্টারমশায় বেরিয়ে এলেন—ওই দূরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে—ওখানে একটা কালভার্ট আছে। ঘরে ঢুকে ফোন তুলে খবর দিতে শুরু করলেন। চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ এমনিতেই প্লাটফরমে লোক জমায়েত ছিল। এখন গ্রামের দিক থেকেও লোকজন আসতে শুরু করল।

বম্ব স্কোয়ার্ডের লোকেরা কালভার্টের কাছে পুড়ে যাওয়া তার ধরে ধরে পরাণের ঝুপড়ির কাছে পৌঁছাল তখন বেলা আটটা। বাঁধন খুলে ওদের মুক্ত করলে প্রায় অচেতন পরানকে শুইয়ে দিতে হলো মাচায়, বসন্ত কয়েকবারের চেষ্টায় উঠে দাঁড়াতে পারল, বলল—জল—

—কারা এ কাজ করল?—অফিসার প্রশ্ন করলেন।

বসন্তর মাথা ঘুরছিল, কোনক্রমে আবার বলল - জল - তারপর দাঁড়াতে পারল না, পড়ে গেল।

এ গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, স্ট্রেচার এল, দুজনকে আনা হল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, স্যালাইন দেবার ব্যবস্থা হল, বেশ কয়েকজন রাইফেলধারী পুলিশ মোতায়োন হল।

দুপুর পেরিয়ে বিকেল, বসন্ত অনেকটা সুস্থ বোধ করছিল, পরাণদা তখনো প্রায় অচেতন।

কয়েকজন অফিসার এলেন, বসন্তর চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালেন, একজন টুল টেনে নিয়ে বসলেন, বসন্ত দেখল সকালের সেই অফিসার, জিজ্ঞাসা করলেন - কারা এ কাজ করল?

—চিনি না—বলল বসন্ত ঘরে একা ছিলাম, হঠাৎ ঢুকে পড়ে রিভলভার নিয়ে, আমাকে বসিয়ে রাখে। পরাণদা এসে ঘরে ঢুকলে পরাণদাকে ভয় দেখিয়ে আমার মুখ হাত পা বেঁধে ফেলতে বলে, বাঁধা হলে লোকটা নিজে পরাণদাকে বেঁধে ফেলে। সবসময়ই ভয় দেখাচ্ছিল—বাধা দিলে মাথায় গুলি করে দেবে। তারপর বেরিয়ে গেল, ওই ঝাঁকাটা নিয়ে এল কি সব করছিল, বাইরে গিয়ে কি সব করে আবার এসে বসল, ভোর পর্যন্ত ছিল, তারপর চলে গেল।

—কেমন দেখতে লোকটাকে?

—এমনিই, সাধারণ চেহারা, ঝাঁকায় করে এটা ওটা নিয়ে যারা হাটে বাজারে যায় তাদের মতোই। বাবু, দয়া করে ওকে যদি একটু ডাক্তারখানায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন—পরাণকে দেখিয়ে বলল বসন্ত—তার সত্যিই ভয় হচ্ছিল পরাণদার না কিছু হয়ে যায়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওনারা।

স্টেশন থেকে স্ট্রেচার এল। এ গ্রামে ডাক্তারখানা আছে, বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। স্ট্রেচার তুলতে গেলে অপারগ বসন্ত। যেভাবে পিঠমোড়া বাঁধা ছিল যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল সে। ভীড়ের মধ্যে থেকে দুজন এগিয়ে এলো, নিয়ে চলল, অনুসরণ করল বসন্ত। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল তার।

... এই মানুষটা সারা জীবন কত কষ্ট করেছে কিন্তু এমন কষ্ট কখনও পায়নি ... আমিই এর জন্য দায়ী ... আমার ভালো করতে গিয়ে ... আমাকে ক্ষমা কর পরাণদা ... যেভাবে হোক তোমাকে ভালো করে তুলতেই হবে ... কিন্তু—এক মিনিট দাঁড়াও ভাই আমি আসছি—ঘরে ফিরল সে, জমা টাকা সবটাই নিল। দরজায় পাহারা বসেছে—দেখতে চাইল কি নিচ্ছে—দেখাল সে, এগিয়ে গেল।

একজন অফিসার সঙ্গে এলেন, ডাক্তারবাবুকে যথোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বললেন, টাকাও দিলেন, বসন্তকে বললেন—আমাদের না জানিয়ে দুজনে কোথাও যেন চলে যাবেন না।

—কি যে বলেন, উনি তো অজ্ঞান আর আমি—ওনাকে ছেড়ে কোথায় যাব! আমার শরীরেরও যা অবস্থা!

—ওনাকেও দেখবেন ডাক্তারবাবু—বলে বেরিয়ে গেলেন।

স্যালাইন দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন ডাক্তারবাবু। বসন্ত শিয়রে বসল।

—চিন্তার কিছু নেই—বললেন ডাক্তার—দেখি আপনার পালস্

—আমার কিছু খাওয়া দরকার সেই কাল সকালে খেয়েছি। একটু মুড়ি জল পেলেই চলবে তাহলেই আমি অনেক সুস্থ হয়ে উঠব। দেখি বাইরে—যারা পরানকে বহন করে এনেছিল তারা চলে গেছে, পিছন পিছন দু চারজন কৌতূহলী যারা এসেছিল তারাও ফিরে গেছে। এখানে আর কোনো মজা নেই।

বাইরে বেরল বসন্ত, ভালো করে চারদিক দেখল। এটা রাধামাসীর বাড়ীর উল্টোদিক, কিছুটা ফিরে ডানদিকের রাস্তা ধরতে হবে—সাধ্য মতো দ্রুত পা চালাল সে।

রাধামাসীর বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ। কড়া নাড়ল সে।

—কে?—মিনতির গলা।

—আমি, পরানদার ভাই।

দরজা খুলল, ঢুকে নিজেই দরজা বন্ধ করল, ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল—ভরত আছে?

—হ্যাঁ, আসুন, কি ব্যাপার বলুনতো? রাত্রিবেলা এসে জানালায় ধাক্কা দিচ্ছে। তখন আমরা শুয়ে পড়েছি, দরজা খুলতে ছুটে ঢুকে পড়ল, ভয়ে কাঁপছে, খালি বলছে আমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। কারা জিজ্ঞাসা করলে বলে—ওই ওরা। বললাম পরাণদারা কোথায়? বললে—ওরা আটকে রেখেছে, আমাকে লুকিয়ে রাখ, কাউকে বোলো না। অনেক বুঝিয়ে কিছু খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছি। সকালে শুনলাম রেললাইনে বোমা ফেটেছে।

—সে অনেক ব্যাপার—বলল বসন্ত—সব বলা যাবে না এখন, ওকে তোমরা দয়া করে কদিন থাকতে দাও, আর আমাকে একটু মুড়ি দাও জল দিয়ে, কাল থেকে কিছু খাইনি। পরানদাও খুব অসুস্থ, ওপাড়ায় ডাক্তারবাবুর ওখানে স্যালাইন চলছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল ভরত, জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। মিনু গেল মুড়ি আনতে, রাধামাসীকে দেখা যাচ্ছে না।

—কি হয়েছিল বলত?—চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল বসন্ত।

—আমি মাস্টারবাবুকে বলেছি—বোমা মেরে গাড়ি উড়িয়ে দেবে—অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বলেই পালিয়ে এসেছি, দাদা আমাকে কি ধরে নিয়ে যাবে?

— না না, ভাবিস না, মাস্টারবাবুতো বলছিলেন—একটা লোক অফিস ঘরের জানলা দিয়ে বলে পালিয়েছে।

—রেলগাড়ি উড়ে গেছে দাদা? অনেক লোক মারা গেছে?

—না রে, মাস্টারবাবু দুপাশের স্টেশনে খবর দিয়ে সব গাড়ি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

মিনু মুড়ি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

চোদ্দ

এখন বিকাল। পরানদার জ্ঞান ফিরেছে। স্ট্রেচারে করেই এনে ঘরে শুইয়ে দিয়ে গেল দুজন লোক। ঝাঁকা সমেত সমস্ত উপকরণ নিয়ে গেছে অফিসাররা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছে ওইটুকু ঘরের সবকিছু। চলে গেছে কৌতূহলী জনতাও। পরানদার সামনে বসল বসন্ত একটা হাত তুলে নিল নিজের দুহাতের মধ্যে, বলল—পরাণদা, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। পরাণদার ঠোঁটের কোনে ভেসে উঠল একটু হাসি।

বসন্ত উঠল, গুটিয়ে রাখা মশারিটা টাঙিয়ে দিল, বাইরে এসে দুয়ারে বসল।

.... অজিত, এই তো আমার স্বাভাবিক জীবন ... আমি এই জীবনেই থাকতে চাই ... কিন্তু ভিক্ষা নিয়ে নয়, ঘুষ নিয়ে নয় ....

.... অজিত, আমরা যা চাই ওরা দেবে না ... সামান্য কিছু হয়ত দেবে, তারও অনেকখানি আবার ভাগ করে নেবে কিছু ধান্দাবাজ স্বার্থান্বেষীর দল ... কিন্তু ওরা যা চায় তা পাওয়ার জন্য দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরেও চেষ্টা করে চলবে ... একটু একটু করে ভেঙে ভেঙে ... অতএব চলবেই যুদ্ধ ....

... অজিত, আমরা নগন্য মানুষ, মাটির জীবনে ধন্য থাকতে চাই ... কিন্তু ...

... আমি এক পলাতক যোদ্ধা, দুর্বল, স্বার্থপরের মতো বাঁচতে চাই আমি শান্তিতে স্বস্তিতে, সেটুকুর জন্য রসদ সংগ্রহ করে এগিয়ে চলার চেষ্টা করব আমি, চেষ্টা করব ভাইকে শিক্ষিত করে তুলতে ... নিজেকেও গড়ে তুলতে ...

.... দিলীপ স্যার বলতেন—শিক্ষাই আনে চেতনা ... ভাইকে তৈরি করতে হবে এক চেতনাময় মানুষ! দিলীপ স্যারের মৃত্যু আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে ফেলেছে দূরে, আমার প্রতিবেশীর মৃত্যু আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে ফেলেছে দূরে...

... ঠিক পথ কি আমি জানি না, কিন্তু এ ও মনে হয় ওই পথ ঠিক পথ নয় ...

... পরাণদা বলে সে একটা হিসাবের বাইরের মানুষ, রেশন কার্ড নেই, ভোটার কার্ড নেই!—কিন্তু ওই মানুষটা আমাকে শুধু বাঁচায়নি—বাঁচার পথও দেখিয়েছে ...

আমি ওর পাশেই থাকব, এভাবেই চলব, আর অপেক্ষা করব নতুন দিনের ....

ওরা কি আমাকে মেরে ফেলবে? কিন্তু আমি তো ওদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, শুধু নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি মাত্র। যা হয় হবে, কিন্তু আমি পরাণদাকে ছেড়ে যাব না, বরং ওর সহায় সম্বল হব। বয়স ওকে ক্রমশ জীর্ণ করছে, সারাদিন ট্রেনে ট্রেনে ঘুরেঘুরে কতদিন আর টানবে! কিছু একটা করতে হবে। ওই দোকানটা নিয়ে ওর একটা স্বপ্ন আছে - দুখু মায়ের দোকান - কিছু একটা করতে হবে।

(এই কাহিনীর সব চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক।)